পঞ্চশস্য।

সংগ্রাহক
শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

"Poor worm! thou art infected;
This visitation shows it."

—*Shakespeare.*

কলিকাতা।
১নং বিবি রোজিও লেন হইতে
শ্রীঅজেশচন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩২৮

মূল্য এক টাকা
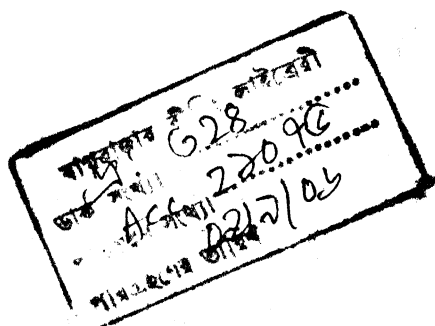
শ্রী ____ কে

এই অকিঞ্চিৎকর

পঞ্চশস্য

র নিদর্শন স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

উৎসর্গ পত্র।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ,

শ্রীচরণে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়,

শিলঙ্‌প্রবাসকালীন সাহিত্যসাধনাকল্পে বহুদিন পরস্পর সহযোগিতা করা গিয়াছে। তাহার নিদর্শনস্বরূপ আপনার 'প্রবন্ধাষ্টক' আমাকে উপহার দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এতদিনে আমার এই অকিঞ্চিৎকর 'পঞ্চশস্য' আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

'কেশব-কুটীর',
চুঁচুড়া।
১৩২৮, শ্রীপঞ্চমী।

প্রীতিবদ্ধ
শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

সূচনা।

প্রদীপ, প্রবাহ, জন্মভূমি, অনুসন্ধান, নব্যভারত, সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে এই 'পঞ্চশস্য' সঙ্কলিত হইল। অকালতিরোভাব বশতঃ ঐ সমস্ত সাময়িক পত্রের অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কলনে সাহিত্যের কোন লাভ না থাকিলেও, ইহা সেই অতীতের স্মৃতির উন্মেষকল্পে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে,—এই বিবেচনায় ইহার প্রতি কোন সহৃদয় পাঠকের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িলে পরম আপ্যায়িত হইব।

সংগ্রাহক।

পঞ্চশস্য।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পঙক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২ ১৭ ১৮	৬ ১৩ ৯,১৯	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ।
১৩	৮	বিভগের	বিভাগের।
১৭	৫	জারাধনা	আরাধনা।
৩০	১২	নির্ব্বাণ	নির্ব্বাহ।
৫৭	২১	মন্ত্রণা	মন্ত্রণা।
৫৯	১৬	ভুল	ভুল।
৬৯	১	ত্রিভূবন	ত্রিভুবন।
৭৩	২০	ভক্তিষোগ	ভক্তিযোগ।
,,	,,	প্রভুতি	প্রভৃতি।
৭৪	১৫	যেনি	যিনি।
৭৫	১৪	প্রেমকের	প্রেমিকের।
৭৬	১৯	ঘনিষ্ঠভা	ঘনিষ্ঠতা।
৮৯	৭	গাম্ভীর্য্য সোহাগ	গাম্ভীর্য্য, সোহাগ।
,,	১৭	মহাশয	মহাশয়।
৯৭	১০	আমার	আমরা।
৯৯	১৫	স্বামীসহবাস	স্বামিসহবাস।
১০০	২৩	খেলাছলে	খেলাচ্ছলে।
১০৪	১০	মাতুয়ারা	মাতোয়ারা।
,,	২৩	লবেস	লবেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১০৭	১৯	তদাবর্তীর্য্যাহং কারর্য্যামি	তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামি।
১১০	৭	সন্ম্যাসী	সন্ন্যাসী।
,,	১১	বাধাকাঙ্ক্ষী	বধাকাঙ্ক্ষী।
১২২	১২	দেঘিয়া	দেখিয়া।
১২৫	১৯	সমূজ্জ্বল	সমুজ্জ্বল।
১৩২	২০	শান্তিরূাপণা	শান্তিরূপিণী।
১৩৫	১২	ঘরিয়া	ঘুরিয়া।
,,	১৫	*কল কৌশলে	কল-কৌশলে।
১৩৮	শেষ	মলরার	মরলার।
১৪০	৩	স্বামীপুত্রের	স্বামিপুত্রের।
,,	১৭	প্রেম্মানুরাগিনী	প্রেমানুরাগিণী।
১৪১	৩	স্বামীপুত্রে	স্বামিপুত্রে।
১৪৫	২,৩	স্বামী-মুখে	স্বামিমুখে।
১৪৬	৪	ছল-চল	ছল-ছল।
১৪৮	১৭	জ্যোতিচ্ছটা	জ্যোতিঃচ্ছটা।
১৫০	৩	নিধানং	নিধানম্।

১। পুণ্যচরিত—

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

[৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আখ্যাত।]

মহারাণী শরৎসুন্দরী।

[শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।]

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

[৺ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আখ্যাত জীবনচরিত।]

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যচরিতমালা সর্ব্বদাই আলোচনার বিষয়—তাহার আর সময়াসময় নাই। এই বিশ্বাসে, ভক্তিভাজন ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক আখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত অবলম্বনে, সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের সুপবিত্র চরিত্রে আমরা সাধারণতঃ কি কি সদ্‌গুণ দেখিতে পাই, এবং শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেও আমরা সেই আদর্শে কতদূর ক্রিয়ানুষ্ঠান করি, তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রাজার লোকাতীত চরিত্রে গুণাবলী অগণ্য, আলোচ্য গ্রন্থও সমুদ্রবিশেষ,—তাহা মন্থন করিয়া সকল কথার আলোচনা আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তির অতীত; তবে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, তাঁহার যে কোন কথারই উল্লেখ করি, তাহাতে পুণ্যাত্মার পবিত্র চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করিবার আশঙ্কা নাই—ইহাই ভরসা।

১। **মাতৃভক্তির পরিচয়।**—চরিতাখ্যায়ক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইহা স্বাভিমত না হইলেও, স্বর্গীয় রাজার জ্ঞাতি ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথায় আমরা প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারি। রামমোহনের মতপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত-কালে মাতৃচরণদর্শনলালসায় তাঁহাকে না-কি এক দিবস পরিহিত পরিচ্ছদ খুলিয়া, গোময়ে চরণ স্পর্শ করিয়া, দেবালয়সমীপবর্ত্তী মাতৃভবনে গমন করিতে হইয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ এই ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন।" করিবারই কথা; নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রত্যক্ষদেবতা

পিতামাতার অপ্রিয়সাধন করা ও তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা যেন একটা পৌরুষের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা

"ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা"

বলিয়া যাঁহাদিগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অসভ্য পৌত্তলিক বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। কিন্তু মহাত্মাগণের জীবনী-মাত্রেই প্রায় দেখা যায়, পিতৃমাতৃভক্তিই তাঁহাদিগের মহত্বের অন্যতম লক্ষণ। অধিক দিনের কথা নহে, অস্মদ্দেশীয় বিদ্যাসাগরচরিত্রই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

২। **মাতৃভাষার পরিচর্য্যা।**—তদানীন্তন পারস্য ভাষা-প্লাবিত দেশে স্বর্গীয় রাজাই "সাধারণপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্য প্রকাশের প্রবর্ত্তক। * * * ষোড়শবর্ষ বয়সে সম্পূর্ণরূপে অন্য লোকের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া তিনি গদ্য রচনা করিয়াছিলেন।" স্বদেশীয় লোককে সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা সুকর উপায় নাই ভাবিয়া মহাত্মা রামমোহন বাঙ্গালা গদ্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাতে আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন, এবং মাত্র ধর্ম্মপ্রচারে বা ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদে তাহা নিবদ্ধ না রাখিয়া ভূগোল, খগোল, ব্যাকরণ, প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংবাদপত্র পরিচালন করেন। অধুনা কিন্তু তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমন্দিরে, তাঁহারই স্মরণার্থ সভায়, ইংরাজিতে বক্তৃতা ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হয় না; পরন্তু প্রজাসাধারণকে দেশের দুরবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রকাশ্য সভায় ইংরাজি ভিন্ন অপর ভাষাই ব্যবহৃত হয় না। অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে দশবিধ ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়াও মহাপুরুষ মাতৃভূমির কার্য্যে মাতৃভাষার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন, আর দেশোদ্ধার করিতে বসিয়া অধুনাতন স্বদেশভক্তগণ বিজাতীয় ভাষা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতে পান না। কেহ বলেন, মাতৃ-

ভাষায় লিখিতে বা বলিতে তিনি অক্ষম, কেহ বা বাল্যে মাতৃভাষার অনুশীলন না করা প্রযুক্ত তজ্জনিত ত্রুটী অনুভব করিয়াও যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার সংশোধনের উপায় দেখিতে পান না। * প্রথম কথার যে কোন মূল্য নাই, স্বর্গীয় মহাত্মার জীবনীতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, আর শেষোক্ত কথার অযৌক্তিকতা শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনায় স্বীয় বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনপ্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

৩। **জাতীয়তা রক্ষা**।—কি ঘরে, কি বাহিরে, কি লৌকিক আচারে, কি পারিবারিক ব্যবহারে, কোন ক্ষেত্রেই রাজা রামমোহন রায় জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেন না। ব্রহ্মবিৎ হওয়াই যে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ, নিজের কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; "শাস্ত্রানুসারে আহার-বিহারের ও সন্ধ্যা-বন্দনা করার ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন;" সমুদ্রযাত্রাকালেও জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করেন নাই, বরং দুগ্ধপান করিবার নিমিত্ত সঙ্গে সুলক্ষণসম্পন্না গাভী লইয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে উপাসনামন্দিরে ব্রাহ্মণ আচার্য্য কর্তৃক উপনিষৎ পঠিত হইত, দেশীয় প্রথায় উপাসকবৃন্দের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত; †

---

* আমাদিগের গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধাস্পদ কোন বন্ধু এক সময়ে আমাদিগকে সত্য সত্যই লিখিয়াছিলেন—"But the great drawback is, what I should be ashamed to confess, an inability to pen two lines in what is my mother tongue. * * * If I had made an attempt to overcome this difficulty earlier in life, perhaps I should have by now been able to write at least intelligibly, if not elegantly, in Bengali; but it is too late now." দুঃখের বিষয়, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

† কেবল পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহার জাতীয় ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অবশ্য উপাসনামন্দিরকে তিনি যেরূপ "রাজরাজেশ্বরের দরবার" ভাবিতেন, তাহাতে

সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই তিনি সর্ব্বত্র আত্মপরিচয় দিতেন। অধুনাতন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে এ সকল বিষয়েরই বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক, যত কিছু বিদেশীয় সমাজের অনুকূল ও স্বদেশীয় সমাজের প্রতিকূল প্রথা এক্ষণে ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে,—এমন কি, সমাজমন্দিরেরও প্রায় সমস্তই ইংরেজী গির্জ্জা-গৃহের অনুকরণে গঠিত ও উপকরণে পূরিত হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু 'হিন্দু' শব্দের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইয়া আধুনিক প্রত্যেক রামমোহনশিষ্য 'হিন্দু' নামে আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যও স্বর্গীয় মহাত্মা জাতীয় প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রাজার মতে, "প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হওয়াই উচিত। * * * হিন্দু জাতির জাতীয় অবস্থা, প্রয়োজন, শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার অনুসারে তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার আবশ্যক। * * * যদিও তিনি উদার অসাম্প্র-দায়িক ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথাচ তিনি জাতীয় ভাবে এবং জাতীয় শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন।" অধুনাতন সংস্কারকার্য্যে ক্রমশঃ জাতীয়তার অভাব হইতেছে বলিয়াই, আমাদিগের বোধ হয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত সম্প্রদায়ভেদ ঘটিতেছে; ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই সুসংস্কৃত হইতেছে, ততই খৃষ্টহীন খৃষ্টীয়ানীর আকার ধারণ করিতেছে।

৪। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা।—আলোচ্য জীবনচরিত হইতে উপরি-

তৎকালীন রাজদরবারোপযুক্ত মুসলমানী পরিচ্ছদব্যবহার কিছু অসঙ্গত নহে; কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনায় পরিচ্ছদব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর যে মত প্রকাশ করিতেন তাহাই সমীচীন বোধ হয়।

উদ্ধৃত অংশ পাঠেই স্পষ্ট বুঝা যায়, হিন্দুশাস্ত্রে রাজার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। পরন্তু তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সমাদর করিতেন। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খৃষ্টিয়ানের বাইবেল—তাঁহার সমান আদরের বস্তু ছিল। এক দিকে তিনি যেমন কোন শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না, অপরদিকে তেমনই সকল শাস্ত্রকেই ভগবত্তত্ত্বপ্রতিপাদক বলিয়া সম্মান করিতেন; ফলতঃ, "তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবলম্বী হিন্দু * ছিলেন।" তিনি সত্যান্বেষণোদ্দেশে যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

এই মূল মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া সকল শাস্ত্র হইতে যুক্তিসঙ্গত সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারই সাহায্যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিতেন। ইহাই প্রকৃত হিন্দুত্বের লক্ষণ। অত্যন্তানুরাগ বশতঃ ইদানীং অনেক হিন্দু যেমন তাঁহাদিগের শাস্ত্রই অভ্রান্ত বোধে অন্য শাস্ত্রের সারগ্রহণে বীতশ্রদ্ধ, তদ্রূপ কারণে অধুনাতন অনেক ব্রাহ্ম তেমনি হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন রসাস্বাদ না করিয়া উহার প্রতি অযথা অবজ্ঞাপরায়ণ।

৫। সার্ব্বজনিক সম্মান।—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টিয়ান-নির্ব্বিশেষে পরম হিন্দু রামমোহন যেমন সকল শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, নির্ব্বিশেষে তদ্রূপ বিশ্বপিতার প্রত্যেক সন্তানের প্রতি তিনি অকপট সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

---

* আলোচ্য জীবনচরিতে এস্থলে 'ব্রাহ্ম' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হিন্দু'শব্দগত আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধবশতঃই, বোধ হয়, ঐ পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে; নতুবা মহাত্মা রামমোহন ত স্বয়ং কোথাও 'ব্রাহ্ম' নামে পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আলোচ্য জীবনীতে দেখা যায় না, বরং নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন সত্ত্বেও স্বপ্রচারিত একেশ্বরবাদ সমর্থনকল্পে তিনি সনাতন হিন্দুশাস্ত্রকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে বাজারের নগণ্য মুটে পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত সমান আলাপের পাত্র ছিলেন। শাস্ত্রানভিজ্ঞ অথবা তর্ককুশল ব্যক্তির প্রতিও তিনি কখন অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এখন আমাদিগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?—আমরা মুখে সাম্যের দোহাই দিলেও কার্য্যতঃ ঘোর বৈষম্যই প্রকাশ করিয়া থাকি,—নির্দ্ধন অপেক্ষা ধনীর প্রতি, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিতের প্রতি, পরধর্ম্মী অপেক্ষা স্বধর্ম্মীর প্রতি, সহজেই অধিকতর অনুরাগ-পরায়ণ হই—পক্ষান্তরে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াও পার্শ্বে একজন বিজাতীয় ব্যক্তিকে বসিতে স্থান দিই না। * "ধর্ম্মজিজ্ঞাসাই সার্ব্বজনিক সম্মানস্পৃহার মূল ভিত্তি"; ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অনুক্ষণ জাগ্রৎ ছিল বলিয়াই তিনি অকপট বিশ্বপ্রেম বিতরণে সমর্থ হইয়াছিলেন,—আর আমরা মুখে ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা আমাদিগের মধ্যে "প্রসুপ্ত ও পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে," তাই ভ্রাতৃভাব-সংস্থাপন করিতে গিয়াও আমরা বৈরভাব প্রদর্শন করিয়া থাকি,—কেহ মতবিরুদ্ধ কথা বলিলেই তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হই।

---

* আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, জনৈক পাদ্রি-পুঙ্গব সাহেব "Gospel of Universal Brotherhood preach" করিবার নিমিত্ত কোন শৈল-সহরে যাইতেছিলেন। সেখানে গমনের জন্য অশ্বশকটই একমাত্র যান। বিদায়প্রত্যাগত সরকারসেবক কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই সময়ে ঐ শকটে গমনপ্রার্থী ছিলেন। সে দিবসে না গেলে তাঁহার ছুটী ফুরাইয়া যায়, জীবিকানির্ব্বাহের উপায়টুকু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। এরূপ অবস্থায় বিশেষ অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সাহেব বাঙ্গালী 'বাবু'কে তাঁহার সহিত একত্র যাইতে দিলেন না। বাবু বেচারাকে অগত্যা উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল।—ইঁহাদিগেরই নিকটে আমরা সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত; সুতরাং ঐ ভাব আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে।

এই সার্ব্বজনিক সম্মানের মূলে আত্মসম্মান, পারিবারিক সম্মান, সমাজসম্মান, জাতীয় সম্মান নিহিত; বস্তুতঃ একের অভাবে অন্য তিষ্ঠিতেই পারে না। স্বর্গীয় রাজা স্বীয় জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তাহা জ্বলন্ত ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। আর আমরা আত্মমর্য্যাদা বোধে আত্মাভিমানী হইয়া পড়ি, ভ্রাতার নিজস্ব আত্মসাৎ করিয়া অথবা মাতাকে মুষ্টিমেয় অন্ন না দিয়া পারিবারিক সম্মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি, আপন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিত্য নূতন সমাজ গঠন পূর্ব্বক সমাজসম্মানের চূড়ান্ত দেখাই, জাতিভেদ সর্ব্ববিধ অনিষ্টের মূল ভাবিয়া যত বিজাতীয় ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জাতীয় সম্মান রক্ষা করি, আর বিদেশে চিরবসতি স্থাপন করিয়া স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়া থাকি।

৬। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা।—অতুল প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ মাত্র ধর্ম্মপ্রচারে ও সমাজসংস্কারে জীবন অতিবাহিত করেন নাই; ফলতঃ, "প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই।" ইহাতেই তদবলম্বিত ধর্ম্মের মূল সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "রাজার মতে, কি সমাজতন্ত্র, কি নীতি, কি রাজনীতি, কি ব্যবহারশাস্ত্র, কি লোকশিক্ষা, সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা লোকশ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" এই বিশ্বাসে লোকহিত-পরায়ণ রাজা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মনীতি—সকল বিষয়েরই অনুশীলন করিতেন, জনকাদি আর্য্য রাজর্ষি-গণের ন্যায় তিনি সংসারে থাকিয়া চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিতেন, অথচ ব্রহ্মার্পণজ্ঞানপরতন্ত্রতানিবন্ধন কিছুতেই আসক্ত থাকিতেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধুনা এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী, মহাপুরুষ আদৌ নয়নগোচর হয় না;—এখনকার পণ্ডিতেরা ইংরাজি শিখিতে গিয়া বাঙ্গালা পড়িবার সময় পান না, সরকারি কার্য্য সমাধান্তে পুত্রের

শিক্ষাকল্পে মনোযোগী হইতে পারেন না, রাজনীতির আলোচনায় ধর্ম্মচর্চ্চা ভুলিয়া যা'ন, ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনে নীতিশাস্ত্র বিস্মৃত হয়েন।

প্রবল প্রতিভার সঙ্গে রাজার শারীরিক স্বাস্থ্যেরও অপ্রতুল ছিল না। সুদীর্ঘ দেহ, সুদৃঢ় গঠন, সুন্দর কান্তি, সুরম্য প্রকৃতি—সকলই তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিত, আর দুর্ধর্ষ মানসিক শক্তির সহিত দুর্দ্দমনীয় শারীরিক বল সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যেক কার্য্যে অসাধারণ অধ্যবসায়শীল ও কর্ত্তব্যকুশল করিয়া তুলিত। অধুনা সে মানসিক বলও নাই, সে শারীরিক শক্তিও নাই—বি-এ পাস করিয়াই বালক বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হয়েন; আর সামান্য চিন্তাতেই অধিকাংশ ব্যক্তি চিরদিনের জন্য শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দেন।

৭। **হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।**—মহাত্মা রামমোহন স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লিখিয়াছেন—

"আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের, ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান তাহার, মতবিরুদ্ধ।"

সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপরায়ণ রামমোহন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিবেন কেন? কিন্তু তাঁহার অধুনাতন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী, কালাকাল ও পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে, উহার প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়া থাকেন। * যাহা হউক, কিরূপ পৌত্তলিকতা রাজার আক্রমণের বিষয় ছিল, তাহাই অতঃপর দেখা যাউক। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।"

---

* আমরা স্বকর্ণে শুনিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশিষ্ট সভ্য এক সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সমাগত বালকবৃন্দকে সদুপদেশ প্রদান কালে দেশ-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বিধিবিহিত ভগবদুদ্দিষ্ট প্রতিমাতে পূজা করিবার সময়ে যে ব্যক্তি ভগবানকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল জড় পুত্তলিকার পূজা করে, সেই পৌত্তলিক এবং তাহার পূজাই রাজার আক্রমণের বিষয় ; নচেৎ রাজা স্থানান্তরে স্বয়ং বলিয়াছেন —

"প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন।" *

অতএব এ সকল ব্যক্তি তাঁহার আক্রমণের পাত্র হইতে পারে না। পরন্তু, তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে তদীয় বিদ্যমানতাকালে পূজ্যপাদ রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ মহাশয় পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যে প্রথম ব্যাখ্যান পাঠ করেন তাহাতে আছে †—

"পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয় ; এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তিবিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে, বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে, নদীকে নদী বোধে, ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তিবোধে উপাসনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সর্ব্বথা অযোগ্য হয়।"

ইহা রাজার 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থান্তর্গত ৭ম প্রশ্নোত্তরের বিবৃতি মাত্র। অধুনাতন সমাজমন্দিরে কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ঐরূপ উদার মত কি কেহ

---

* 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থে ৫ম প্রশ্নের উত্তর।—চরিতাখ্যায়ক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, এই গ্রন্থে "রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মত জানা যায়। * * * তিনি এদেশে হিন্দুসমাজে যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ম যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে, এই 'অনুষ্ঠান' পুস্তকখানি অবহিত চিত্তে পাঠ করা আবশ্যক।"

† ভক্তিভাজন চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত "দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশ হইতে গৃহীত।

আচার্যের মুখে শুনিতে পান? ফলতঃ, যাহারা পাষাণকে পাষাণ বোধে, বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে, নদীকে নদী বোধে ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তিবোধে উপাসনা করে, মাত্র তাহারাই রাজার আক্রমণের লক্ষ্য, কেননা সেই উপাসনাই ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণের ও হিন্দুশাস্ত্রের মত-বিরুদ্ধ; আর ইদানীং প্রতিমাবলম্বিত পরমেশ্বর-পূজকমাত্রই ব্রহ্মসমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ ও গ্লানির পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন।

৮। **ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ।**—উপরিলিখিত 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থের প্রসঙ্গক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "রাজার মতে ব্রহ্মোপাসক ও অন্যান্য উপাসকের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকা উচিত নয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।" অবশ্য প্রতিমাদিতে দেবারাধনার বিধি ইতর অধিকারীর নিমিত্ত,—যাঁহাদিগের প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাঁহাদিগের তাহাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কয় জনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়াছে? লক্ষণের দ্বারা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিতান্ত বিরল। কবিতা-কারের সহিত বিচারে রাজা

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"

এই বচনানুসারে কহিয়াছেন, "যাহাকে দেখিব যে এ ব্যক্তি কেবল কর্ম্মী বটে এমত নহে, বরঞ্চ অজ্ঞানকর্ম্মী, তখন তাহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই।" অর্থাৎ "অনধিকারীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেই না।"*

তবে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ লাভে অধিকারী বা ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ কি?

---

* রামমোহনভক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় কথিত তাৎপর্য্যার্থ আমরা এ স্থানে গ্রহণ করিলাম। চরিতাখ্যায়ক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" অংশের উল্লেখ না করিয়া কিরূপে এই অংশের "ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি যত্নবান্ নিষ্কাম কর্ম্মীর বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, কিন্তু অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামস কর্ম্মীদিগকে জ্ঞান সাধনে উপদেশ দিবে"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

উল্লিখিত 'অনুষ্ঠান' গ্রন্থে ৯ম প্রশ্নের উত্তরপাঠে বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নশীল এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এক মাত্র পরমেশ্বরের শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক। রাজা 'ইন্দ্রিয়দমন' ও 'প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাস' কথা সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই—তাহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আত্ম-পরের সমভাবে ইষ্টজনক ও অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ কার্য্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে নিযুক্ত করার নাম 'ইন্দ্রিয়দমন'; এবং পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, ও শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা পরমাত্মচিন্তন ও জগতের উপকারসাধক অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রীহি, যব, ওষধি প্রভৃতি পরমেশ্বরাধীন ও পরমার্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলনের নাম 'প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাস।' ফলতঃ, শম-দম-বিবেক-বৈরাগ্যাদি-জনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে হৃদয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপচিত হইতেই পারে না আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যতিরেকে অপরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র। শাস্ত্র একথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, শাস্ত্রপরায়ণ রামমোহনও স্পষ্টাক্ষরে সেই কথাই বলিয়াছেন। এখন কিন্তু সর্ব্বত্র পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরিত হইতেছে, আর এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞেরাই জ্ঞানহীন পৌত্তলিকদিগকে নরকস্থ করিয়া স্বর্গের সোপানে অধিরোহণ করিতেছেন। চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—

"যেমন ইংরাজি সমুদয় ব্যাপারই দ্রুতগতিশীল, সেইরূপ ইংরাজি ধাতুতে বিরচিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মও দ্রুতগামী। যেমন ইংরাজদিগের রেল-শকট দ্রুতগামী, তাড়িত-বার্ত্তাবহ দ্রুতশক্তিবিশিষ্ট, কাজ-কর্ম্ম অসম্ভব দ্রুত, চাল-চলনও অত্যন্ত দ্রুত, সেইরূপ এই ইংরাজি ব্রাহ্মধর্ম্মও ভয়ানক বেগবান। কেননা আজ তাহা কলিকাতায় প্রচার হইতেছে, কাল মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে প্রচার হইয়া গেল, পরদিন ইংলণ্ডে যেমন বক্তৃতা হইল অমনি শত শত লোক উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।" *

---

* বসুজ মহাশয় মান্দ্রাজ ও বোম্বা'য়ে প্রচারের কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তিনি বোধ হয় খাসিয়া পাহাড়ে প্রচারের সংবাদ রাখেন নাই। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ

৯। ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ।—হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বিষয়েও ব্রহ্মজ্ঞ রামমোহন যেরূপ শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ সম্বন্ধেও তাঁহাকে তদ্রূপ প্রত্যয়শীল দেখিতে পাওয়া যায়। "গোস্বামীর সহিত বিচার" গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক?"

পরন্তু, "কবিতাকারের সহিত বিচার" গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু যেস্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে, তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।"

তবে তিনি স্থানান্তরে ('ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে) ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"কি রামকৃষ্ণ বিগ্রহে, কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন।"

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়,

"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উচিত যে রামকৃষ্ণ হরিহর প্রভৃতি দেবতা শব্দে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝেন। তাঁহাদের পূজাতে ব্রহ্মপূজা জ্ঞান করেন, অথচ তাঁহাদের রূপ-গুণ বিশেষণকে মায়াজন্য ও মিথ্যা বলিয়া জানেন।" *

দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত অনেক কোল-ভীল-সাঁওতালগণের, অনেক বর্ণজ্ঞানবিহীন মুসলমানের, গ্রামস্থ সকলকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া 'বাহবা' লইয়াছেন; তদ্দর্শনে অধুনাতন ইংরাজি তন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মপ্রচারকগণ খাসিয়াগণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারবৃদ্ধি করিতেছেন। উল্লিখিত মুসলমানগণ পৌত্তলিক হিন্দুর কালীপূজাতে রথযাত্রাতে যোগ দিয়া থাকে এবং বলে "পেটের দায়ে খ্রীষ্টান হইয়াছি বলিয়া ইঁদুর দেবতা ছাড়িতে পারি?" উ-ব্লেই-ভক্ত ব্রাহ্মগণও তদ্রূপ প্রয়োজনমত কখন যীশুতে, কখন বা তাহাদিগের স্বসম্প্রদায়গত প্রেতদেবতায়, উ-ব্লেই সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে।

* পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত। এরূপ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের আপন সিদ্ধান্তে ভ্রম জন্মিবার আশঙ্কায় ব্রহ্মপরায়ণ রামমোহনভক্ত চন্দ্রশেখর বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল।

শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধসমন্বয়ার্থ স্বর্গীয় রাজা বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান অপ্রধান কেহই নাই, প্রত্যুত সকলই ব্রহ্মের উপাধিজ্ঞাপক; অধুনা হিন্দুসমাজে শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব, আর ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্রহ্মের মায়িক উপাধিমাত্রের প্রতি নিন্দাবাদ লক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন এই উভয়বিধ আচরণেরই বিরোধী ছিলেন।

১০। জাতিভেদ।—প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথার প্রতি আস্থাবান না হইলেও, রাজা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার মতে, শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয়। এই বিশ্বাসে তাঁহার সময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই উপাসনামন্দিরে আচার্য্যের পদে বরিত হইয়া বেদোক্ত ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যান করিতেন। পরন্তু, "সমাজ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ধর্ম্মের একটি ভিত্তি।" এই সমাজশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বৃত্তিগত ব্যবহারানুসারে সমাজে ভিন্ন রূপ শ্রেণীবিভাগেরও উপকারিতা দেখা যায়। কিঞ্চিৎ একদেশদুষ্ট ও অতিরঞ্জনদোষগ্রস্ত হইলেও 'একাকার' নামক প্রহসনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ইদানীং হিন্দুসমাজে নবধা কুললক্ষণবিবর্জ্জিত ব্যক্তিকে কুলীন, ব্রহ্মজ্ঞানপরিশূন্য ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিমাত্রকেই শূদ্রভাবে গ্রহণ, পরন্তু পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ, যেমন অহিন্দুর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে,—জাতিভেদ দূষণীয় বলিয়া শুকাদি পক্ষীর ন্যায় ব্রাহ্মসমাজনির্দ্দিষ্ট কতিপয় শ্রুতি-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞাপক বাক্যের আবৃত্তিক্ষম আচণ্ডাল ব্যক্তিমাত্রকেই এক-শ্রেণীভুক্ত করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তদ্রূপ যুক্তিবিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে। *

* কেবল এই ভাবেই ব্রাহ্মসমাজে জাতিসমন্বয় হইয়াছে; নতুবা, ব্রাহ্মেরা এক জাতি, হিন্দুরা ভিন্ন জাতি; 'আদি,' 'বিধান,' 'সাধারণ,' ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি

এইরূপে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায় তিনি স্বদেশভক্ত, সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপরায়ণ, অনাসক্ত, সাধুপুরুষ ছিলেন ;—ব্যক্তিবিশেষে, সমাজবিশেষে, শাস্ত্রবিশেষে, বা দেবতাবিশেষে কুত্রাপি তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অগণ্য গুণগ্রাম হৃদয়ঙ্গম করা বা সেই গুণপ্রকাশক জীবনচরিতের আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সমালোচনা করা আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তির ও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অতীত ; * তবে তাঁহার জীবনী পাঠে আমরা এই পর্য্যন্ত শিখিতে পারি—

১। মতবিরোধী হইলেও পিতামাতার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হওয়া কর্ত্তব্য ;

২। বৈদেশিক বহু ভাষা শিক্ষা করিলেও মাতৃভাষার সেবা করা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় ;

৩। বৈদেশিক সত্য সঙ্কলন করিয়া তাহা দেশীয় আকারে পরিণত করা উচিত ;

৪। যাবতীয় কার্য্যে জাতীয়তা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ;

(ইঁহাদিগের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিদ্যমান) ; ধনী-নির্ধন-ভেদে, পদ-মর্য্যাদার তারতম্যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ;—এইরূপ নানাবিধ জাতিভেদ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অসঙ্কুচিত চিত্তে পরান্নগ্রহণ পক্ষে, বোধ হয়, জাতিবিচার নাই। কিন্তু বৈবাহিক বন্ধনকল্পে অধুনা জাতিবিচার লক্ষিত হয়। সম্পন্ন ব্রাহ্মগণকে প্রায়ই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সচেষ্ট দেখা যায়।

* এস্থলে বলা আবশ্যক, কোনরূপ বিদ্বেষভাবপ্রণোদিত হইয়া আমরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম-সমাজসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। প্রত্যুত, হিন্দু ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা যে বিস্তৃত ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে, তাহা রোধ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। যাহাতে "যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মরূপে এবং হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে" পরিণত হয় এবং উভয় সমাজের মধ্যে অকপট জাতীয় ভাব সংরক্ষিত হয়, স্বর্গীয় মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনার দ্বারা আমরা তাহাই স্বীয় জ্ঞানমত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

৫। সমাজ ও সামাজিক শৃঙ্খলা ধর্ম্মের একটী ভিত্তি, পরন্তু লোক-শ্রেয়ঃসাধনই পরম ধর্ম্ম ;

৬। অনাসক্ত ভাবে সংসারসেবা ও আড়ম্বরশূন্য হইয়া পরমার্থচিন্তা অনুষ্ঠেয় ;

৭। জুগুপ্সা পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রের সত্য গ্রহণ করা ধর্ম্মোন্নতিসাধক ;

৮। ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদ বিবেচ্য ;

৯। প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত, পরন্তু অনধিকারীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নিষ্ফল ;

১০। শম-দম-বৈরাগ্যাদিজনিত চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রণবাভ্যাস দ্বারা একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ;

আর তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা করি যেন তাঁহার আদর্শে চরিত্র গঠন করিয়া তাঁহার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক উদারতার কণাংশও লাভ করিতে পারি।

মহারাণী শরৎসুন্দরী।

[শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত জীবনচরিত।]

"শত শত কবিকল্পিত আদর্শে চরিত্রগঠনের যত সাহায্য না করে, একজন মহাত্মার জীবনীতে তদপেক্ষা বিস্তর ফল লাভ হয়।" স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী এইরূপ মহাত্মার অন্যতম;—"আর্য্যললনার আদর্শচরিত্রের বহুলাংশ" ইঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—আর্য্যনীতিধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী অন্তঃপুরচারিণী হিন্দুরমণীর পক্ষে তিনি প্রকৃতই 'প্রাতঃস্মরণীয়া'। "শরৎসুন্দরী, পাঁচ বৎসর সাত মাস বয়সে পতিকুলে আসিয়া বার বৎসর সাত মাস বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পর চব্বিশ বৎসর দশ মাস কাল জীবিতা ছিলেন। তিনি বাল্যে পতিকুলে আসিয়া, আপনার কর্ত্তব্য সকল অতি সাবধানে নির্ব্বাহ করিয়া, পতিদেবতার পারলৌকিক আত্মার সহিত—বিশ্বকারণ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়াছেন।"—এই প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুললনার পবিত্র জীবনী সঙ্কলন করিয়া গিরীশ বাবু একাধারে স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও সতীত্বের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন তৎসঙ্কলিত জীবনী হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর কর্ত্তব্যসাধনের দুই এক অংশ আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব।

সঙ্কলিত গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। মহারাণীর (১) বাল্যজীবন ও শিশুশিক্ষাপ্রণালী; (২) বিবাহ, গৃহিণীত্ব ও বিদ্যাশিক্ষা; (৩) অকালবৈধব্য; (৪) বৈধব্যান্তে চরিত্রবিকাশ এবং (৫) স্বকর্ত্তৃত্ব ও কলেবরত্যাগ, যথাক্রমে, ঐ পাঁচ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রসঙ্গালোচনার পূর্ব্বে জীবনীলেখক লাহিড়ী মহাশয় 'মহাত্মা'-গণের স্বরূপ বর্ণনে চেষ্টা করিয়াছেন এবং, প্রকৃতিভেদে, তাঁহাদিগকে

চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শরৎসুন্দরী ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত—বুঝিবার নিমিত্ত, জীবনী-লেখকের নির্ব্বাচিত শ্রেণীবিভাগ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার মতে—

১। এক শ্রেণীর মহাত্মা জগৎকে আপনা হইতে অভিন্ন দেখেন। তাঁহারা ব্যক্তরূপাপ্রকৃতিজড়িত অব্যক্তরূপ পুরুষের আরাধনা করেন এবং আপনার উৎকর্ষের সঙ্গে জগতের উন্নতিকল্পেও ক্ষিপ্রহস্ত থাকেন। * * * চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং অনেক শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি এই জাতীয় মহাত্মা ছিলেন।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাত্মারা আদর্শ মহাত্মার গুণের পক্ষপাতী। স্বয়ং মহাত্মা না হইলেও, সৎশিক্ষক। তাঁহারা কেবল ব্যক্তরূপা প্রকৃতির সেবক,—অব্যক্তরূপে চিত্ত সমাধান করিতে পারেন না। নীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানবেত্তা এবং উচ্চ শ্রেণীর কবিরা এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণ, কেবল আত্মোৎকর্ষ ব্যতীত, সমাজ বা লোকশিক্ষার্থ অগ্রসর নহেন। ইঁহাদিগের মধ্যে—

(ক) কেহ কেহ সমাজ হইতে চির বিদায় লইয়া ঘোর অরণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কার্য্য লোকলোচনের বহির্ভূত।

(খ) কেহ বা গৃহে থাকিয়াই স্বকর্ত্তব্য পালন করেন। তাঁহারা সমাজের মধ্যে থাকিয়াও, এরূপে আত্মগোপন করেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব অন্যে বুঝিতে পারে না। সেই প্রাণের প্রাণ বিশ্বের বীজে একীভূত হইবার জন্য তাঁহাদিগের জীবননদী অন্তঃসলিলারূপে প্রবহমানা। এই শ্রেণীর মহাত্মারা ব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে অব্যক্তরূপ জগদীশ্বরকে, স্ফটিকে রক্তপুষ্পের আভাসস্পাতের ন্যায়, দর্শন করেন।—আপনার ছায়া সর্ব্বভূতে দেখেন, জগৎকে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হইতে কিংবা জগতে আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

৪। চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মারা স্বদেশপ্রেমিক বীর। তাঁহারা স্বজাতির জন্য, স্বদেশের জন্য, আপনার দেহ উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রকৃতির মূলতত্ত্বে লক্ষ্য রাখিয়া. তাঁহারা সংসারকে সুসংযত করিতে যত্নশীল ;—লক্ষ্যসাধনে, স্বজাতির হিতের জন্য, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

অতঃপর, স্বর্গীয়া মহারাণী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত—বুঝিতে বাকী থাকে না; তথাপি. জীবনচরিতকার স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তিনি তৃতীয় (খ) শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণের মধ্যে জ্বলন্তভাবে প্রকাশমান ; সেইজন্য বলি, বঙ্কিম বাবুর গঠিত শ্রী, জয়ন্তী বা প্রফুল্লমুখী অপেক্ষা স্বভাবসুহিতা শরৎসুন্দরীর পবিত্র জীবনী লোকসাধারণের চরিত্রগঠনপক্ষে অধিকতর সুফলদায়ক, আর যিনি সেই জীবনের স্তর ভেদ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত চরিত্রগুলির মধ্যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বদেশপ্রেমিকতার সুন্দর ভাব সংজড়িত ; সেই প্রেমময় বীরত্বে অনু-প্রাণিত ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তদ্রচিত আদর্শরমণী-গণকে পুরুষসুলভ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে এবং প্রয়োজনমত স্বয়ং বিগ্রহক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। মানবহৃদয়ের এই গুণগ্রাম উপরিলিখিত চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মাগণের বিষয়ীভূত। শরৎসুন্দরীর হৃদয়ে এই গুণের অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার পতি-দেবতা রাজা ৺ যোগেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক সেই অপূর্ণতাটুকু বিনষ্ট হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের "হৃদয় প্রদীপ্ত তেজে—দুর্দম উৎসাহে—পরিপূর্ণ ; তিনি নীলকরবিদ্রোহপ্রশমনে আপনার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত অর্থ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিবেন বলিয়া" প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের সন্তান—দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, তথাপি পৈতৃক সম্পত্তির একবিন্দু ভূমি থাকিতে, আমার দেহে জীবন থাকিতে, এই মহৎ ব্রত ত্যাগ করিব না। ইংরেজাধিকারের অনেক পূর্ব্ব হইতে আমার পুরুষানুক্রমিক স্বত্বভোগের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক বাস্তভূমি। আমি সেই বাস্তভূমিতে জন্মিয়া এই সমস্ত নিরীহ প্রজার প্রদত্ত রক্তের অংশে পরম সুখে পালিত হইয়াছি। প্রজারা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতা। সেই পবিত্র জন্মভূমিতে, সেই পবিত্র বাস্তুতে. যে বিদেশীয়েরা, বাণিজ্যের ছলে প্রবেশ করিয়া, অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে. তাহাদিগেরই সহিত বন্ধুভাবে সন্ধি করিব? আমার এ ছার জীবনে ধিক্! এমন কলঙ্কিত জীবন আমি এক নিমিষের জন্যও চাহি না।" ইহজীবনে তাঁহার সঙ্কল্পভঙ্গ হয় নাই;—অন্যবিধ নানারূপ অত্যাহিতের সঙ্গে নীলকর-অত্যাচার-জনিত নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তার বেগে অচিরেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমরূপ পবিত্র "ধর্ম্মবলে জয়লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকলা প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠী কয়েকটী অতি অল্পদিনের মধ্যেই জনশূন্য হইয়াছিল,- নীলকরদিগের গুদামরূপ কারাগারে কৃষকদিগের আর্ত্তনাদ বন্ধ হইয়াছিল,—প্রাণপণ চেষ্টাবলে তিনি নীলকরদিগের 'নিজজোত' নামক বিস্তর ভূমি আপনার করায়ত্ত করিয়া পূর্ব্বাধিকারী প্রজাকে দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা. নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিকতা এবং প্রকৃত আত্মত্যাগসমন্বিত মহত্ত্বজনক প্রজাবাৎসল্য, এই হতভাগ্য নির্জীব দেশে অনেকেরই শিক্ষণীয়।"—হিন্দুমতে, স্ত্রীপুরুষ একাঙ্গ; যোগেন্দ্রনারায়ণ-শরৎসুন্দরীর শুভপরিণয়ে মণিকাঞ্চনসংযোগ হইয়াছিল, উভয়ের একীভূত জীবন কবিকল্পিত পূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন্ত লীলা প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, যোগেন্দ্রনারায়ণ ও শরৎসুন্দরীর ঐহিক সম্মিলন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। "যৌবনের প্রথম উদ্যমে, অতৃপ্তজীবনে,

একুশ বৎসর এগার মাস মাত্র বয়সে, যোগেন্দ্রনারায়ণ ইহধাম পরিত্যাগ করেন;" আর স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী তখন অস্ফুটকুসুমকলিকা—দাম্পত্য-সুখানভিজ্ঞা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা,—বাল্য-যৌবনের সন্ধিস্থলে অলক্ষিত ভাবে উপনীতা,—সেই 'যৌবনসন্ধিকালে' অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসমানা বিয়োগবিধুরা বাল্যবিধবা। ভগবানের এই বিচিত্র লীলা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়, সংসারসুখের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া ভ্রান্তিময়ী মায়ার পেষণে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আজিকার দিনে, যে বয়সে বিবাহ মাত্র সংঘটিত হয় না, 'বি-বা-হ' নাম শুনিয়া পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকগণ বিস্ময়বিকলিতচিত্তে শিহরিয়া উঠেন, সেই বয়সে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী বালিকা—বিধবা। 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের সদ্বিবেচনায় সেই বালিকা সদজ্ঞানবিরহিতা, পতির পতিত্ব উপলব্ধি করিতে একেবারে অশক্তা,—যুক্তি-তর্কের আনুকূল্যে পূর্ণ যোড়শবর্ষ বয়সে পুনরায় বিবাহিতা হইবার উপযুক্তা। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অলোকসামান্যা বালবিধবা সেই বয়সেই "পতিদেবতা কিরূপ প্রেম ও ভক্তির পাত্র, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। পতি বিদ্যমানে কোন দিন তাঁহার নিকট প্রগল্‌ভতা কিংবা চপলতা প্রকাশ করেন নাই। যোগেন্দ্রনারায়ণকে তিনি, বাস্তবিকই, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। দাম্পত্যসুখের অতৃপ্তি এবং অকালবৈধব্যে, তাঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য এবং অকামধর্ম্ম দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি, সধবা কিংবা বিধবা, কোন অবস্থাতেই পতি-দেবতার কোন দোষ দেখিতে পান নাই, অথচ পদে পদে আপনার নগণ্য দোষও দেখিতে পাইতেন।" বর্ত্তমান প্রথানুসারে বিধবার পক্ষে বামহস্তে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ড বদ্ধ করিলেই বিগতজীবন স্বামীর উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সম্মান করা হইত, কিন্তু "যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর শরৎসুন্দরী যে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তৈলসংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত

তাহাই পালন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট বিধবার কর্ত্তব্য-গুলি একে একে বুঝিয়া লইয়া সেই ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ভূমিশয্যায় শয়ন, তৈলসংস্কারাদি বর্জ্জন এবং ব্রত উপবাসাদি ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিলেন।" এই অবস্থায়, কার্য্যসূত্রে, কোন দিন রাজসাহীর কালেক্টর-পত্নী রাজান্তঃপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, মোটা বস্ত্র পরিধান, ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া, মনঃকষ্টের আবেগে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"রাণি! আমাদের দেশে তোমার মত বালিকা-বয়সে কাহারও বিবাহই হয় না, অথচ তুমি এই বয়সে এরূপ কঠোর ব্রত কেন করিতেছ?—আমি জানি, তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার পুনরায় বিবাহের বিধান আছে; অতএব তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেও ক্ষতি নাই।" বালিকা শরৎসুন্দরী এই কথা শুনিয়া নতমুখে কেবল অনর্গল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। হিন্দু বিধবার প্রকৃতিতত্ত্বানভিজ্ঞা সাহেববনিতা তদ্দর্শনে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া নানারূপ বিনতির সহিত পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। "শরৎসুন্দরীর চিত্ত কিছুতেই আশ্বস্ত হইল না; * * * তিনি সেই দিন হইতে তিন দিবস অনাহারে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য, এই ঘটনা তাঁহার প্রকৃতিরই পরিচায়ক, পুরুষপ্রবর্ত্তিত সমাজশাসনের নিদর্শন নহে।

কুসুমকোমল কিশোর বয়সে ঐরূপ কঠোর কর্ত্তব্য পালন করা বাস্তবিকই কি অসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার?—বোধ হয়, তাহা নহে। শিক্ষা, সংসর্গ ও অভ্যাসগুণে সকলই সহজ হইয়া পড়ে; নতুবা, রাজ-বনিতা, ধনীর দুহিতা, শরৎসুন্দরীর পক্ষে উল্লিখিত প্রথা অনুসরণ করা কখনই সম্ভব হইত না। জন্মান্তরবাদী হিন্দু ভিন্ন প্রাক্তনফল কেহ স্বীকার করেন না; কিন্তু, যে কারণেই হউক, 'সহজাত মূলপ্রকৃতি' শিশুর বাক্যস্ফুরণের সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই

প্রকৃতিজাত কার্য্যপরম্পরা প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে এই মূলতত্ত্ব সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শিক্ষাগুণে ঐ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত ও সদাচারোন্মুখী হইয়া থাকে; এই জন্য শিশুপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাকে সংশিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—তন্মধ্যে "আবার জননী-রূপিণী গৃহলক্ষ্মীদিগের দায়িত্ব গুরুতর বুঝিয়া বড়ই সাবধান হইতে হয়।" সৌভাগ্যক্রমে, শরৎসুন্দরীর জীবনে এই উভয়বিধ ঘটনাই সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল;—"তাঁহার মূলপ্রকৃতির অঙ্কুরেই অব্যক্ত মহত্ত্ব ছিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ আত্ম-প্রতিভার ক্ষীণজ্যোতিতে মিশিয়া তাঁহার বালিকা-স্বভাবেই বিরাজ করিত। তিনি বাল্যকালে যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ ছিলেন, প্রকৃতিও সেইরূপ শুদ্ধ ও শান্ত ছিল। তাঁহার দেহে সেই বয়সেই স্ত্রীজনসুলভ লজ্জার সঞ্চার হইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গাবস্থায় থাকে, শরৎসুন্দরী সেই বয়সে আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন; বহির্বাটীতে আসিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তাঁহার শিশুচরিত্রে এরূপ গুণসমাবেশের প্রধান কারণ—তাঁহার পূজনীয়া জননী। জননী দ্রবময়ী অতি সুশীলা এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ অব-গুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। তিনি আজীবন সংসারের কোন কর্তৃত্বে যাইতেন না,—অন্যের অধীনা হইয়া অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী, সেই গর্ভে জন্মিয়া, সেই দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া, সেই সুশীলা জননীর সৎকার্য্যের সহচরী হইয়াই, বাল্যকালে এইরূপ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। * * * বাল্য-খেলাতেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুষ্ঠান ছিল,—খেলাচ্ছলে তিনি দেবপূজা, জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। ইহার পর বাড়ীতে কোন ব্রত-নিয়ম অথবা দেবার্চ্চনাদির উৎসব হইলে, তাঁহার খেলায় মন থাকিত না। তিনি,

মাতার সঙ্গে প্রবীণার ন্যায়, ব্রতপূজাদির দ্রব্যজাত আয়োজনে প্রবৃত্তা হইতেন। অন্যের দৃষ্টান্তে শুদ্ধাচারে ও পবিত্রদেহে থাকিয়া, অতি দক্ষতার সহিত, ঐ সকল কার্য্য করিতেন। শিবরাত্রি এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতির উপবাসের জন্য বিনীতভাবে পিতামাতার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে কেহই উপবাসের বিধি দিতেন না; তখন অন্যে তাঁহার শান্তিকর লাবণ্যময় মুখে মালিন্য দেখিতে পাইত। কিন্তু হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট হইলেও, কদাচ পিতামাতার নিকট ধৃষ্টতা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেন না,—হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়েই দমন করিতেন।”

একদিকে জননীর অন্তঃপুরের ঐ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা, অপরদিকে “পিতার বিস্তৃত অতিথিশালা তাঁহার সুশিক্ষার সাহায্য করিয়াছিল। সেই বাল্যজীবনেই পিতার অতিথিশালা দেখিয়া সংসারকে পরমপিতার একটী অতিথিশালা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই স্বচক্ষে অতিথিদিগকে ভোজ্য-বিতরণ দেখিতেন এবং সেই অতিথিশালা-প্রবাসী নানা শ্রেণীর লোকের নিকট নানা কথা শুনিয়া, মনুষ্যজীবনের চরম বিভীষিকা ভাবিয়া, দরিদ্রের ও ব্যাধিগ্রস্তের দুঃখ এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়া, বালিকা শরৎসুন্দরী সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতেন ও সততই, আপনার সাধ্যমত, তাহাদিগের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ, সংসারীর এই সকল দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মদুঃখে বিস্মৃতি, ত্যাগ, ক্ষমা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের উন্নতি লাভ করিয়াছিল।”*

আলোচ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে শরৎসুন্দরীর বাল্যজীবনের সৎশিক্ষালাভের ঐরূপ শত শত সুন্দর উপকরণ সজ্জিত। কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী লইয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আলোচনার অধীন করিব, ভাবিয়া উঠা সুকঠিন। তবে আমারা যে কয়েকটী প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, শরৎসুন্দরীর ভবিষ্যজ্জীবনের উপযোগী চরিত্রগঠনের জন্য বাল্যে শিক্ষার উপকরণের অপ্রতুল ছিল না। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা

নিতান্ত বিরল বলিয়া অধুনাতন 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ অভি-
যোগ ও ক্ষোভ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উল্লিখিত রূপ নীতিশিক্ষা
অপেক্ষা হিন্দুললনার পক্ষে অন্য কি সুশিক্ষা হইতে পারে, আমরা বুঝিতে
অক্ষম। নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সাংসারিক সুসারের জন্য, ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ
দ্বারা চিত্তবৃত্তিপরিমার্জ্জনের নিমিত্ত, অক্ষরশিক্ষারও প্রয়োজন ঘটিয়া
থাকে। শরৎসুন্দরীর জীবনে সে প্রয়োজনও সুসিদ্ধ হইয়াছিল।
শিক্ষানবিশ অবস্থায় কলিকাতায় অবস্থান কালে শরৎসুন্দরীর স্বহস্তলিখিত
পত্রাভাবে যুবক যোগেন্দ্রনারায়ণের হৃদয় আশ্বস্ত হইত না। প্রিয়তমা
ভার্য্যার এই অভাব উপলব্ধি করিয়া "যোগেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের ছুটি
উপলক্ষে বাটী আসিয়া শরৎসুন্দরীকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন,
এবং পুনর্ব্বার কলিকাতা যাত্রাকালে জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি
তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভারার্পণ করিয়া গেলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে
শরৎসুন্দরী কর্ত্তৃক যোগেন্দ্রনারায়ণের অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালিকা
স্বয়ং যোগেন্দ্রনারায়ণকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক অল্প
অল্প শিক্ষায় দুই বৎসরের মধ্যে শরৎসুন্দরী ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে ও
বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছাপার মত হইয়াছিল।" এই
শিক্ষা পতি বর্ত্তমানে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিয়াছিল এবং
কালক্রমে, স্ব-কর্ত্তৃত্ব সময়ে, বিষয়কার্য্যপরিচালনা পক্ষেও বিশেষ সহায়
হইয়াছিল। "আহারান্তে বসিয়া, নানা স্থানের সমাগত তাঁহার নামীয়
সমস্ত পত্র তিনি স্বয়ং পাঠ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের জন্য অতি
অল্পশিক্ষিত হইতে সুশিক্ষিতদিগের অসম্পূর্ণ কদর্য্য অক্ষরও অবাধে
পড়িতে পারিতেন এবং তাহার ভাব উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতেন। ইহা
ভিন্ন, দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার পর, সাময়িক সংবাদপত্র ও
ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন; পুরোহিতদিগের নিকট ব্যাখ্যা সহ সংস্কৃত
গ্রন্থের অর্থ শুনিতে শুনিতে সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার প্রবেশিকা-শক্তি

জন্মিয়া ছিল,—বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি সংস্কৃত পুস্তকও পড়িতেন।” লক্ষ্যভ্রষ্ট ইংরাজি শিক্ষা না ঘটিলেও এবং দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্যোপন্যাসের রসাস্বাদন না করিলেও, সাংসারিক ও পারত্রিক মঙ্গলানুকূল শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার জীবনে কোনরূপ অসদ্ভাব ঘটে নাই।

সভ্যজগতে এবং এতদ্দেশীয় অধুনাতন শিক্ষিতসমাজে যাহা কিছু অরুচি ও অপ্রীতিকর বোধ হয়, যাহা সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিকূল দেখা যায়, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশে বলিতে পারি না, শরৎসুন্দরীর জীবনে তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ হয়। বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ না ঘটাতে সাহেব-গৃহিণীকে আমরা আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। শরৎসুন্দরীর শিক্ষার যে চিত্র আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, বর্ত্তমান রুচির বাজারে তাহা শিক্ষা বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে না। তার পর, তাঁহার বিবাহের কথা। আজি কালি বিবাহ-বিভ্রাটের গতিকে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহও ‘সমাজে’ বাল্যবিবাহ বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতেছে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রকে ঐরূপ বয়সের বালিকা কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে, আর এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীর বিবাহ ঘটিয়াছিল—পাঁচ বৎসর সাতমাস বয়সে! বিবাহের পর সাত বৎসর মাত্র তিনি সধবা ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুসময়েও তিনি সম্পূর্ণ বালিকা।' এ অবস্থায় যোগেন্দ্রনারায়ণ ও শরৎসুন্দরীর পরস্পর পতিপত্নী-সম্বন্ধবোধ ও সানুরাগ সহানুভূতির উদ্রেক কি সম্ভব?—সম্ভব! শরৎসুন্দরীর জীবনেই তাহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত।

শিশু বয়সে বিবাহিতা হইয়াও, “তিনি অল্পদিন মাত্র পিতৃভবনে ছিলেন। * * * পিত্রালয়ে থাকিলে বালিকার স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া নৈতিক উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় যোগেন্দ্র-নারায়ণ তাঁহাকে পিতৃভবনে না পাঠাইয়া সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন এবং, জননী অভাবে, এক বিধবা মাতুলানীকে শরৎসুন্দরীর অভিভাবিকা নিযুক্তা করিয়াছিলেন। এই বিধবা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সুশীলা ছিলেন এবং

শরৎসুন্দরীকে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন; বালিকাও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। * * * যোগেন্দ্রনারায়ণের আদরে, ক্রমে ক্রমে, বালিকা যেন এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলেন। বালিকার হৃদয় ধীরে ধীরে যোগেন্দ্রনারায়ণের বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল। তখন, বিবাহের কথা মনে উদয় হওয়ায়, যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার অভিভাবিকা, প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে, যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি বালিকার কর্ত্তব্যগুলি যাহা বুঝাইতেন, বালিকা তাহা আপনার হৃদয়ে অতি গোপনে রক্ষা করিতেন। সীতা-সাবিত্রী-চরিত্র অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন, আর চিত্তকে সেই পবিত্রতায় লইতে চেষ্টা করিতেন। স্বামীর ভালবাসা লাভ করিবার জন্য বালিকার হৃদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। তিনি যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি অতি পরিপাটীরূপে প্রস্তুত রাখিতেন,—কোন কার্য্যে প্রায় দাসদাসীর সাহায্য লইতেন না; অথচ, কোন প্রকারে প্রগল্‌ভতা বা নিলর্জ্জতা প্রকাশ পাইত না। ইহাতে যোগেন্দ্রনারায়ণও আস্তে আস্তে সেই বালিকার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন।” ইহাপেক্ষা বাল্যদাম্পত্যের সুখকর চিত্র আর কি হইতে পারে?

পতিবিয়োগান্তে সাধ্বী শরৎসুন্দরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কোন কার্য্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। এখন আর কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া সংসারী অবস্থায় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয় দিব।—(১) “বিধবার কর্ত্তব্য একাদশী, শ্রাবণা দ্বাদশী, জন্মাষ্টমী, আশ্বিন ও চৈত্র মাসের মহাষ্টমী, রামনবমী, প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক উপবাসাদি ভিন্ন, আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত যত প্রকার ব্রত আছে, একে একে শরৎসুন্দরী তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তদুদ্দিষ্ট উপবাসাদি যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রতাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী আদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। (২) অবিরাম জ্বরে একদা নিতান্ত কাতরা

ও পিপাসায় মূর্চ্ছাপন্না হইয়াও, অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণবিশেষের ব্যবস্থাসত্ত্বেও, একাদশীতে জল পান করেন নাই, বরং ঐ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণগণের প্রতি আজীবন কাল অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। (৩) বৃন্দাবনে পদব্রজে চতুরশীতি ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন,—ভাদ্রমাসের প্রখর মেঘান্ত রৌদ্রের মধ্যে গমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেও, একমুহূর্ত্তের জন্যও পাল্কীতে আরোহণ করেন নাই। (৪) পতিদেবতার আসন্নকালে শুশ্রূষা করিতে না পারার জন্য চিরজীবন ক্ষোভ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতেন;—পিতার আসন্নকালে একান্তমনে তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। (৫) তিনি দেহকে একটা পদার্থ বলিয়াই জানিতেন না। বিধবা হইয়া অবধি তিনি দেহকে মৃতপ্রায় বোধ করিতেন এবং সেই অকিঞ্চিৎকর দেহ কেবল ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্ষুধাতুরকে আহার দিলেই নিজে পরিতোষ লাভ করিতেন,—প্রার্থীর অভাব পূর্ণ করিলেই আপনার প্রভূত শান্তি অনুভব করিতেন,—পীড়িতের পীড়াশান্তি করিলেই আপনাকে সুস্থদেহা বিবেচনা করিতেন। (৬) ব্রতোপবাসে তাঁহার অধিক দিন গত হইত; মাসের মধ্যে যে অল্পদিন আহার করিতেন, তাহাও সামান্য হবিষ্যান্ন। (৭) তিনি ঘোরতর পাপাত্মাকেও নিন্দা করিতেন না,—কাহারও নিন্দা শুনিলে বক্তাকে সবিনয় নিষেধ করিতেন। (৮) তাঁহার মতের বিরুদ্ধে অতি সামান্য লোক বক্তা হইলেও প্রতিবাদ করিয়া তাহার মনে ব্যথা দিতেন না। (৯) মহারাণী গুরুতর অপরাধীর বিরুদ্ধেও ফৌজদারী করিতে অনুমতি দিতেন না। (১০) ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিয়মাদি স্বয়ং করা ভিন্ন অন্যকে প্রতিনিধি দিতেন না। তিনি জানিতেন যে, চিত্ত-সংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই ব্রতাঙ্গ উপবাসের এবং সংযত আহারের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি ব্রত দ্বারা শরীরের অসৎপ্রবৃত্তি সকল দমন এবং সৎ-প্রবৃত্তি সকল উন্নত না হইল, তবে ব্রত করার ফল কি?”—মহাতপস্বিনী

মহারাণীর প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; আলোচ্য গ্রন্থেও তাহার বিস্তর উল্লেখ আছে। সকল কথার পুনরাবৃত্তি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সীমাবহির্ভূত। তবে তাঁহার আসক্তিবিবর্জ্জিত আর কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিব।

আত্মীয়কুটুম্বাদিবধজনিত মহাপাপের মধ্যেও শ্রীভগবান্ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে অনার্য্যজনোচিত অকীর্ত্তিকর মোহ পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য-সাধনে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরীর "অমানুষী ক্ষমাশীলতা এবং ত্যাগস্বীকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও", আত্মস্বত্বরক্ষা রূপ কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ দেখা যায় না। বিষয়ভার স্বকর্তৃত্বে গ্রহণ করার পর তিনি তৎপূর্ব্বসূচিত ভূসম্পত্তিঘটিত বিবাদ সকল যতদূর সাধ্য সহজে মীমাংসা করিলেন। পরন্তু, যাহা নিতান্ত ক্ষতিকর, অথচ প্রতিপক্ষীয়েরা স্বার্থত্যাগে অসম্মত ছিলেন, তাহার ন্যায্য স্বত্ব উদ্ধারের জন্য তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তবে "তাঁহার অকপট সার্ব্বজনীন উদারতায় নিতান্ত শত্রুও নতশিরে বাধ্য হইতে লাগিল,—শত্রুতা দূরের কথা, অল্পদিনের মধ্যে সকল অংশীই তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন।"—প্রকৃত দরিদ্রের অযাচিত ভাবে দুঃখ-মোচন করা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; এইরূপ ও অন্যবিধ সহস্র সৎকার্য্যোপলক্ষে তিনি রাশি রাশি ধন বিতরণ করিতেন, অথচ "বিধবা হইবার দিন হইতে, রজত-কাঞ্চন, মণি-মুক্তা, কিংবা টাকা-মোহর কখন স্পর্শ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ বিস্তর বিচিত্র বস্ত্র, শাল, বনাত, বিতরণ করিতেন, কিন্তু আপনি একখানি মোটা কাপড়েই শীত-গ্রীষ্ম সমভাবে অতিবাহিত করিতেন,—পৌষ-মাঘ মাসের দুরন্ত শীতেও পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল ব্যতীত অপর গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। বহুমূল্য আসনাদি দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিতেন, অথচ স্বয়ং মৃত্তিকাসনে উপবেশন করিতেন,—ক্রিয়া-কলাপাদি উপলক্ষে অবশ্য

ব্যবহার্য্য আসনের কার্য্য কুশাসনই সম্পন্ন করিত। আবার এতাদৃশ বিষয়নিস্পৃহা স্বত্বেও রাজপ্রসাদস্বরূপ 'মহারাণী'-উপাধি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এইরূপ একদিকে অনুষ্ঠান, অপর দিকে অনাসক্তি, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতি এবং তদুপলক্ষে পণ্ডিতবর্গকে দান; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অর্থ-সাহায্য, বিনা সুদে ঋণদান এবং তাহা পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা, অসমর্থ লোকের চিকিৎসাব্যয়, তীর্থগমন ও তীর্থবাসের ব্যয়, বিদ্যালয় এবং চতুষ্পাঠীতে পাঠের ব্যয় ও পরীক্ষার ফী, বিদ্যালয়গৃহনির্ম্মাণ, জলাশয়-নির্ম্মাণ, পথপ্রস্তুতকরণ, বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী এবং সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন, দেবালয়নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতিসাধন, পুস্তকমুদ্রণকার্য্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারকে প্রচুর অর্থানুকূল্য, চিকিৎসানুসঙ্গতির জন্য ডাক্তার ও কবিরাজ নিয়োগ, প্রভৃতি নানা কার্য্যে মহারাণীর দান, দয়া ও সুকীর্ত্তি অদ্যাবধি ঘোষিত হইতেছে।

শরৎসুন্দরীর চরিত্রের যে সকল অঙ্গ উপরে আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে, "হিন্দুসন্তানের চক্ষে পবিত্রা আর্য্যনারীকুলের আদর্শস্বরূপা" বলিয়া পূজিতা হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। কথিত আছে, "অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও একবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।" 'মহারাণী' উপাধি প্রদানেই খৃষ্টান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহার চরিত্রে, সম্পত্তি-শাসনপ্রণালীতে, এবং নিঃস্বার্থ দানধর্ম্মে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর অধুনাতন সংস্কারপ্রিয় নব্য সম্প্রদায়ের কথা। "সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী"—এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র; মহারাণীর চরিত্রে এই ত্রিবিধ গুণের কিরূপ ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, এখন একবার আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক। দান, আতিথ্য, পীড়িতের চিকিৎসা, দরিদ্রের সাধ্যমত অভাবমোচন, পরদুঃখ-

কাতরতা, প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, সার্ব্বজনীন 'মৈত্রী'র তাহা অপেক্ষা সুন্দর লক্ষণ আর কি হইতে পারে? 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে জীবনীলেখক লাহিড়ী মহাশয় রীতিমত পূর্ব্বভাব স্থির করিয়া শরৎসুন্দরীর চরিত্রে তাহা আরোপ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—"জীবমাত্রেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে বলিয়া জীবজগতের এত উন্নতি। পক্ষান্তরে আবার, পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যতদূর সাধ্য আঘাত না করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য পরিচালনা করাই জীবের অপার মহত্ত্ব। জীবকুলে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বাধীন হইয়াও পরোক্ষে সর্ব্বপ্রকারে সমাজের অধীন। যে ব্যক্তি আপনার স্বাধীন ইচ্ছার বেগে অকারণে অন্যের স্বাধীনতায় আঘাত করে, সে মনুষ্য হইয়াও পশুর অধম। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই স্ব স্ব স্বাধীনতা পরিচালনার একটী আপেক্ষিক সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা বুঝিয়া, সমাজ কিংবা কাহারও ব্যক্তিগত আপেক্ষিক স্বাধীনতায় আঘাত না পায়, এরূপ ভাবে, সুপথে স্বাধীনতা চালনা করিতে সকলেই অধিকারী। পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছার সীমারক্ষার জন্যই মনুষ্যদিগের মধ্যে সমাজ এবং রাজশক্তির প্রয়োজন। * * * অতএব সংসারে থাকিয়াও যিনি স্বার্থের জন্য কোন কার্য্যেই অন্যের হৃদয়ে আঘাত না করেন—অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন,—তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। জ্ঞানী সংসারীরা প্রস্তাবিত সীমার মধ্যে থাকিয়া পরস্পরবিরোধী জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্যসম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। * * * শরৎসুন্দরী, সংসারে থাকিয়াও অন্যের মনে ব্যথা না দিয়া, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।" সমস্ত সম্পত্তির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেন না, কোন কার্য্য একটা স্থির কল্পনা করিলেও, কর্ম্মচারিগণ সঙ্গত আপত্তি

করিলে সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতেন, এমন কি দানাদি সম্বন্ধেও কর্ম্মচারিগণের সহিত মতভেদ ঘটিলে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে আপন মতে আনিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে, গোপনে আপনার তহবিল হইতে টাকা দিতেন, তথাপি কর্ম্মচারিগণের মনে ব্যথা দিয়া আপন মত প্রবল রাখিতেন না। একদা মহারাণী মাতৃদর্শনপিপাসু হইয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার অনাবৃত বাটীতে যাওয়া অবৈধ এবং পুঁঠিয়ার রাজসংসারের সম্মানবিরুদ্ধ,—অধিকন্তু এরূপ আগ্রহ স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত,—জনৈক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে শরৎসুন্দরী স্বীয় অভিলাষ প্রত্যাহরণ করিলেন। স্বেচ্ছাচার প্রশমনপূর্ব্বক পদমর্য্যাদানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার লক্ষণ ঐরূপ মহারাণীর অনেক কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর 'সাম্য।' বর্ত্তমানকালে সাম্যের লক্ষণ কি, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে, আমাদিগের দৃষ্টিতে এবং জীবনীকারের মতে, মহারাণীর যে সকল কার্য্যে সাম্যভাব লক্ষিত হয়, এ স্থলে তাহারই কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) "অতি হীনজাতীয় হইলেও, তিনি কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট দিতেন না। তিনি শরীরিমাত্রের দেহেই পরমাত্মার স্বরূপ ঈশ্বরাধিষ্ঠান বিশ্বাস করিতেন। (২) আশ্রিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন; সকলের জন্য উত্তমোত্তম আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন হইত, অথচ তিনি প্রাণধারণোপযোগী অতি সামান্য হবিষ্যান্ন আহার করিতেন; সে ভোজনেও তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান কি আসন ছিল না,—আহারের জন্য সকলে উপবেশন করিলে, তিনি হাতে একখান কদলীপত্র লইয়া তাহার এক পার্শ্বে দরিদ্রার মত উপবেশন করিয়া, সংযতভাবে ভোজন করিতেন। (৩) শয়নেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না; অন্যান্য অনাথাগণ শয়ন করিলে

তিনি তাহাদের মধ্যে এক পার্শ্বে অতি সামান্যভাবে কুশাসন কিংবা কম্বলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। সেই রাজান্তঃপুরমধ্যে সকলেই সমান অধিকারিণী, যেন তাঁহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। (৪) একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্তঃপুরে অনেক মহিলার সমাগম হয়। তন্মধ্যে একটী প্রাচীনা দ্বিতল হইতে অবতরণের সিঁড়ির বিপরীত প্রান্তে শয়ানা ছিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার উদরবিকার জন্মে,—তিনি সিঁড়ির অভিমুখে যাইতে যাইতে বেগধারণে অসমর্থা হইয়া পথে মলত্যাগ করিতে করিতে নিম্নে মলত্যাগস্থল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন,—শেষে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া, আপনার শয্যায় আসিয়া শয়ন করেন। প্রভাতে অনেকে সেই ব্যাধিগ্রস্তা প্রাচীনাকে নানারূপ ভৎ'সনা করিতে লাগিল এবং, নানারূপ সুমিষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও, দাসীরা পর্য্যন্ত সেই মল পরিষ্কার করিতে সম্মত হইল না। নির্ব্বিকারহৃদয়া মহারাণী তখন স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া পথের সমস্ত মল পরিষ্কার করিয়া, অন্যে এই সমস্ত বিষয় শুনিতে না পায়, তজ্জন্য সকলকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিলেন।—কি চমৎকার মানবদুর্লভ ঔদার্য্য!" সাম্যের ইহা অপেক্ষা সুন্দর নিদর্শন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

স্বর্গীয়া মহারাণীর নাম বঙ্গের ঘরে ঘরে বিঘোষিত,—অধিকন্তু, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত বিশদভাবে বর্ণিত। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবতারণা না করিলেই চলিত। তবে, আমাদিগের এক 'কৈফিয়ৎ' আছে;—'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক মহাশয়ের কথায় বলিতেছি, উল্লিখিতরূপ "বিশ্বজনীন ভক্তিপ্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।"

২। প্রাচীন কবি—

জগদ্রাম রায়।

[তৎকৃত রামায়ণের 'ভরতবিলাপ।']

কবিরঞ্জন।

[তদীয় রচনার অনুক্রম।]

জগদ্রাম রায়।

[তৎকৃত রামায়ণের 'ভরতবিলাপ।']

কাব্যজগতের কল্পতরুস্বরূপ রামায়ণ রচনা করিয়া কবিগুরু বাল্মীকি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎকৃত বাগ্‌দ্বারে প্রবেশ করিয়া কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি (ভট্ট ?) প্রভৃতি মহাকবিগণও রামকথাশ্রয় মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। "সংস্কৃত কাব্যে বাল্মীকির যে স্থান, বাঙ্গলা কাব্যে কৃত্তিবাসের অনেকটা তাহাই। তিনি বাঙ্গালীর কবিগুরু।" বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া, যেরূপ উল্লিখিত কবিগণ সংস্কৃত কাব্য রচনা দ্বারা "মহীয়সী কবিত্বকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন," কৃত্তিবাসের 'প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া' অন্যান্য অনেক কবি বাঙ্গালা কাব্যেও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তপ্রমুখ সহৃদয় পণ্ডিতগণ যেমন বাঙ্গালার আদি কবি কৃত্তিবাসের মূলগ্রন্থের সমুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন, কৃত্তিবাসসেবক অন্যান্য কবিকৃত রামায়ণেরও উদ্ধারসাধনে তদ্রূপ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গুপ্তপ্রেস ও বটতলার কৃপায়,—পরন্তু দীনেশবাবু, রামানন্দবাবু প্রভৃতির চেষ্টায়,—কৃত্তিবাসের গ্রন্থ এখন, ন্যূনাধিক, বাঙ্গালীমাত্রের গৃহেই বিরাজমান, কিন্তু অন্যান্য কবির গ্রন্থ এখনও জীর্ণ ও কীটদষ্ট পুথীর আকারে কোন অজ্ঞাত পল্লীর নির্জ্জন গৃহে অযত্নভাবে রক্ষিত। কৃত্তিবাসের অকৃত্রিম গ্রন্থে যেরূপ বাঙ্গালা কাব্যের মৌলিক ভাব অবগত হওয়া যাইবে, তৎপরবর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থালোচনায়, কালসহকারে কাব্যসাহিত্যের স্রোত কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও কোন্ অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং অনুকরণদুষ্ট হইলেও, তাঁহাদিগের গ্রন্থ, কৃত্তিবাসকৃত গ্রন্থের তুলনায়, কাব্যাংশে

কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য, নিরূপণ করা যাইতে পারিবে। এরূপ নিরূপণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে সামান্য লাভের বিষয় নহে। এই জন্য বলিতেছিলাম, কৃত্তিবাসী রামায়ণোদ্ধারের সঙ্গে অন্যান্য কবিকৃত রামায়ণের উদ্ধারসাধনে চেষ্টা করাও বিধেয়।

শেষোক্ত রামায়ণগুলির মধ্যে ৺জগদ্রাম রায়ের রচিত রামায়ণ অন্যতম। প্রায় তিন শত বৎসর কাল পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মল্লিবাড়া পরগণার উত্তরপশ্চিম ভাগে দামোদরতীরে ভুলুই নামক গ্রামে জগদ্রাম রায় আবির্ভূত হয়েন। ইনি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন; যে সময়ে কাশীরাম সিঙ্গিগ্রামে বসিয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত লিখিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে ভুলুইয়ে বসিয়া জগদ্রাম সমগ্র রামায়ণ কবিতার রসশালিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।* অতএব প্রাচীনতাংশে জগদ্রামের রামায়ণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। জগদ্রাম সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য শেষ করিয়া, রাবণনিধনার্থ ভগবতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে †

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের মতে "কাশীদাসও ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন।" জগদ্রামের রামায়ণও সংবৎ ১৭৭২ অব্দে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের ২৬৫ বৎসর পূর্ব্বে, সম্পূর্ণ হয়। ইহাকে শকের পরিবর্ত্তে সংবৎ নির্দ্দেশ করিবার হেতু ৩৮।৩৯পৃষ্ঠার পাদটীকায় আলোচিত হইল; একপ নির্দ্দেশ না করিলে, 'রামায়ণ' ও 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র পারম্পর্য্য নির্দ্ধারণে ব্যাঘাত জন্মে ও "তা'পর" শব্দের ব্যাখ্যায় অযথা কষ্টকল্পনা করিতে হয়।

† শরৎকালে দেবীপূজার বিধান শ্রীরামচন্দ্রকৃত দুর্গোৎসবের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" —চণ্ডী। ১২।১২,১৩।

যে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন—তদবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে একখানি খণ্ডকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক নিজপুত্র রামপ্রসাদকে নবমী ও দশমীর পালা লিখিতে আদেশ করেন। নবমী পালারম্ভে রামপ্রসাদ এই ঘটনার পরিচয় দিয়াছেন—

"পিতা জগত্রাম মোর রামপরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥
তা'পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
দুর্গাপ্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥
ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সে অপূর্ব্ব।
নবমী দশমী এই পঞ্চদিন পর্ব্ব॥
পর্ব্বদিন গান মধ্যে শুন বিবরণ।
তিন দিবসের গান করিলা রচন॥
ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সুশোভন।
এ তিন দিনের গান করিলা বর্ণন॥
নবমী দশমী দুই দিবসের গান।
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান॥
অঙ্গীকার কৈনু আমি পিতার বচনে।
আগু পাছু কিছু মাত্র না গণিনু মনে॥"

দুর্গাপঞ্চরাত্রির উপসংহার ভাগে লেখা আছে—

"ভুজ-রন্ধ্র-রস-চন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কৃত্তিকা তারকাযোগ সৌভাগ্য সুন্দরে॥
কাব্য দুর্গাপঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল।
সভাজনে শান্ত মনে হরি হরি বল॥"

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ, কৃত্তিকা নক্ষত্রযুত

শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে, বৃহস্পতিবারে, 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। জগদ্রামের রামায়ণ যে, ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, "যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ" ছত্রটিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। উল্লিখিত কবিতাপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

"শিশুমতি মূর্খ অতি জ্ঞানবিবর্জ্জিত।
ছন্দ-শব্দ-আদি কাব্যবিষয়ে রহিত॥
বালকে বলয়ে যদি অস্ফুট বচন।
তাহা শুনি পিতামাতা হরষিত মন॥
সেহ জন্য মোর কাব্যে নাহি রসলেশ।
পিতারে কি ভাল তেঁই দিলা উপদেশ॥"

কেবল বিনয় প্রকাশের জন্য ঐরূপ লিখিত না হইলেও, রামপ্রসাদ গ্রন্থরচনাকালে অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক বালক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং তদনুসারে সেই সময়ে জগদ্রামের বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ হওয়া সম্ভব। অতএব (১৬০২—৪০) ১৫৬২ শকে, অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, জগদ্রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। *

* রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর তাঁহার দেশবিশ্রুত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থের 'পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত' চতুর্থ সংস্করণে লিখিয়াছেন, "কিঞ্চিৎ অধিক ১২৫ বৎসর হইল, * * * জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন।" কোন্ যুক্তিবলে বা কিরূপ সূত্রে দীনেশবাবু এই মন্তব্যে উপনীত হইয়াছেন, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। কবির বাসস্থানবিবরণপ্রসঙ্গে দেখা যায়, তিনি তাহার তথ্য সম্বন্ধে 'পাক্ষিক সমালোচক' নামক পত্রের নিকটে ঋণী। (এস্থলেও দুই বিষয়ে ভ্রম লক্ষিত হয় ;—প্রথম, উল্লিখিত বিবরণ ১২৯১ ভাদ্রের 'পাক্ষিক সমালোচকে' প্রকাশিত হয়,—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত ১২৯২ ভাদ্রে নহে ; দ্বিতীয়, উক্ত পত্রের মতে ভুলুই গ্রামের উত্তরে দামোদর, দক্ষিণে বিহারীনাথ শৈল,—দীনেশবাবুর গ্রন্থে, উদ্ধৃত অংশে, ঠিক উহার বিপরীত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অথচ তাহার কোন হেতু কথিত হয় নাই।) উক্ত পত্রানুসারে ১৩০২ শকে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সম্পূর্ণ হয় ; দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,

কবি জগদ্রাম তদীয় 'রামায়ণ' গ্রন্থে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী।
দোঁহে জন্মদাতা আমি অধম অকৃতী॥

সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বারে বার।
জিহ্বাতে বলয়ে নাম পদে নমস্কার॥

* * *

শ্রীমাধব রাধাকান্ত রামকান্ত আর।
শ্রীরামগোবিন্দ ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার॥"

১৬৯২ শকে, এবং তাহার সমর্থনকল্পে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'দাসী'তে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়ের মতের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সেই মত অনুসরণ করিতে পারিলাম না। 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র যে অংশে (উপসংহার ভাগে) উহার রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জগদ্রামের রচিত নহে— তৎপুত্র রামপ্রসাদের ; রামপ্রসাদ "তাপর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম" লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন, "যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, 'দুর্গাপঞ্চ-রাত্রি'র পরিসমাপ্তিকালে রামপ্রসাদ তাঁহার পিতার রচিত রামায়ণ কাব্যের বিষয় অবগত ছিলেন ; রামায়ণ রচনার "বিশ বৎসর পূর্ব্বে" তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? পরন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, (সত্যকুমার বাবুর মতানুসারে) দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থের যেস্থানে লিখিয়াছেন, "রামায়ণের * * * বিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' * * রচনা করেন", তাহার চারি ছত্র পরেই, উভয় গ্রন্থের রচনাগত তারতম্যনির্দ্দেশকল্পে, তিনি লিখিয়াছেন, "রামায়ণের * * বর্ণনা * * তত্দূর প্রাঞ্জল নহে। * * 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি কবির পরবর্ত্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ক ও বেশ উপাদেয়।" এই দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথা ও তাহার কোন্‌টা গ্রহণীয় ? ১৬৯২ শকাব্দে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'র পরিসমাপ্তিকাল ধরিলেও, আমাদিগের উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জগদ্রামের জন্মকাল স্থির হয়—"কিঞ্চিৎ অধিক ১২৫ বৎসর" নহে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সদৃশ বিশিষ্ট গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গের আশানুরূপ মীমাংসা না পাওয়ায় আমরা 'পাক্ষিক সমালোচক' পত্রের প্রাচীন মতেরই অনুসরণ করিলাম।

'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তেও পরিচয় পাওয়া যায়—

"রঘুনাথ রায় তাত, শোভা মাতাগর্ভজাত,
একমনঃপ্রাণ ছয় ভাই।
রায়জীত, জগদ্রাম, মাধব, রাধাকান্ত নাম,
রামকান্ত, রামগোবিন্দাই।"

আর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে।

রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত অংশে জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামোল্লেখ না থাকিলেও, কবি যে তাঁহারও সহিত "একমনঃপ্রাণ" ছিলেন, 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদর জীতরায়ের অনুজ্ঞাক্রমেই তিনি ঐ কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন—

"জ্যেষ্ঠ জীতরায়মতে, পঞ্চরাত্রি দুর্গাপ্রীতে,
রচয়ে প্রার্থয়ে জগদ্রাম।"

উপরিলিখিত নামগুলিতে কবির বংশে রামরূপী বিষ্ণুপরায়ণতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, আর রামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পিতা জগদ্রাম মোর রামপরায়ণ।"

কিন্তু মঙ্গলাচরণ পর্ব্বে কবিকথিত—

"এ গোষ্ঠী তোমার দাস, দুর্গে দুঃখ কর নাশ,
সেবে যেন প্রতি বংশক্রমে।"—

এই কবিতার্দ্ধ পাঠে তাঁহাদিগকে শক্তি-উপাসক বলিয়া সন্দেহ জন্মে। যাঁহারই উপাসক হউন, কবির চরিত্রে, অধুনাতন শাক্ত-বৈষ্ণবের ন্যায়, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের চিহ্ন আদৌ লক্ষিত হয় না; তাঁহার বিবেচনায়—

"সর্ব্বচরাচরমূর্ত্তি এক নারায়ণ।
* * *
প্রদক্ষিণে প্রণমিয়ে তাঁহার চরণ॥"

১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মজঃফরপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক 'পাক্ষিক সমালোচক' নামক সাময়িক পত্রে এই জগদ্রাম রায় ও তদ্রচিত কাব্যের বিষয় প্রথমে বর্ণিত এবং কবির রামায়ণ হইতে 'ভরতসংবাদ' নামক অংশ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ঐ 'পাক্ষিক সমালোচক' এখন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কার্য্যসূত্রে ত্রিহুতে অবস্থানকালে ঐ সাময়িক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ আমাদিগের হস্তগত হয়। সরকারি কার্য্যানুরোধে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থানকালে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভুলুই গ্রাম এবং জগদ্রাম রায় ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"(ভুলুই) স্থানটী এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছুদূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজতরেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে। আমি চৈত্র মাসে গিয়াছিলাম, কিন্তু আর তিন চারি মাস পরে এই দামোদরের যে প্রতাপ, তাহা মনে হইলেও ভয় হয়।

"* * * জগদ্রাম রায়ের বংশের কাহাকেও পাই নাই। ভুলুই ও অর্দ্ধগ্রামের অনেক ব্রাহ্মণের উপাধি—রায়। তাহাদিগের কেহই জগদ্রাম রায়ের জ্ঞাতিত্বও স্বীকার করিল না। তাঁহার বংশে অদ্যাপি কেহ জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সেই গ্রামে ও তন্নিকটস্থ গ্রামে অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেকের মুখেই শুনিলাম, ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে তিনি ঐ গ্রামে বাস করিতেন, ও তিনিই রামায়ণরচয়িতা। তাঁহার বাসভূমির স্থান কেহ কেহ নদীগর্ভদিকে দেখাইয়া দিল।

"ঐ গ্রামের অনেকের ঘরেই এই রামায়ণের কোন না কোন অংশের হাতে লেখা পুঁথি আছে এবং শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে তাহার পূজা হইয়া থাকে। তথাকার সকলেই উক্ত রামায়ণকে অতি আদর করিয়া থাকেন ও প্রায়ই তাঁহাদের দ্বারা উহা গীত হইয়া থাকে। পঞ্চকোট রাজ্যমধ্যে সর্ব্বস্থানেই উহার আদর। দুই এক স্থানে কবির

ভণিতিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চকোটের গর্গবংশীয় রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ও অনুগ্রহাশয়ে তিনি ঐ কাব্য রচনা করেন।"

জগদ্রামকৃত রামায়ণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা হীন বোধ হয় না, বরং কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহার বর্ণনা, কবিত্ব ও করুণরসের উচ্ছ্বাস প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরবস্বরূপ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কৃত্তিবাস কবির নিন্দা করা অথবা তুলনায় জগদ্রামের গৌরববৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তথাচ কৃত্তিবাসের ভরতসংবাদে ও জগদ্রামের ভরতসংবাদে যে অনেক তারতম্য আছে, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।"

কিন্তু তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন দেখেন নাই। আমরা এস্থলে কৃত্তিবাস ও জগদ্রামের গ্রন্থ হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ—স্বপ্নদর্শন। মূল রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ভরত দুঃস্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত প্রথমে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, তবে তাঁহার প্রিয়বাদী বয়স্যগণ বাহ্য লক্ষণে তদীয় মানসিক অসুখ বুঝিতে পারিয়া, সেই অসুখশান্তির নিমিত্ত বীণাবাদন, নাটক-প্রহসনাদি পাঠ ও নৃত্যগীতাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং কিছুতেই তাঁহাকে হর্ষিত করিতে না পারায় এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভরতের মুখে প্রকৃত তথ্য অবগত হইলেন। কৃত্তিবাসের ভরত কেবল বয়স্যগণকে বলিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই, তিনি 'আম দরবারে' পাত্র-মিত্র-অমাত্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সভাসদ, সর্ব্বজনকে স্বপ্নবিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; জগদ্রামের ভরত এ সকল কিছু না করিয়া মাত্র প্রিয় ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে নিভৃত মন্দিরে ডাকিয়া কহিলেন—

"আরে ভাই শত্রুঘন, হেথা আসি বসি শুন,
স্বপ্ন কত বিস্ময় দেখি।"

অতঃপর—স্বপ্নবৃত্তান্ত। কবিগুরু বাল্মীকির যুগে অনৈসর্গিক ঘটনা-বর্ণন কবিত্বের অন্যতম উপাদান ছিল, তাই মূল রামায়ণে এইরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—

" * * * * আজি রাত্রিশেষে
জনকেরে দেখিয়াছি আমি স্বপ্নাবেশে ;
মলিন হয়েছে তাঁর দেহের বরণ,
সে চারু মুখশ্রী আর নাহিক তেমন।

তিনি এক পর্ব্বতের শিখর হইতে
মুক্তকেশে পড়ি'ছেন ঘূরিতে ঘুরিতে।
তলায় গোময়ময় হ্রদ ভয়ঙ্কর ;
গিরিহ'তে পড়ে' পিতা তাহার উপর।

দেখিলাম, তিনি সেই গোময়ের হ্রদে
ভাসি'ছেন—ঘৃণা নাই—মাতিয়া আমোদে।
হাসিয়া হাসিয়া যেন অঞ্জলি পূরিয়া
তৈল পান ক'রিছেন থাকিয়া থাকিয়া।

* * * *
* * * *

আবার দেখিনু আমি পিতা মহেষ্বাস
পরিধান ক'রেছেন কৃষ্ণবর্ণ বাস।

লৌহময় পীঠোপরি আছেন বসিয়া,
নিরুত্তর, কিন্তু ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিয়া।
কৃষ্ণকলেবর আর পিঙ্গল আকার
প্রমদা সকলে তাঁরে করি'ছে প্রহার।

রক্তচন্দনেতে পিতা চর্চ্চিত হইয়া,
রক্তমাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া,

গর্দ্দভযোজিত রথে করি' আরোহণ,
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করি'ছে গমন।"

—৺রাজকৃষ্ণ রায় কৃত মূলের অনুবাদ। *

কৃত্তিবাস উল্লিখিত বৃত্তান্তের ছায়া অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—

"কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে।
যেন চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গিয়াছেন বন॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর॥"

ইহাতে বিচিত্র অতিরঞ্জনের মাত্রা অল্প হইলেও, দশরথের তৈলে পতনের ব্যাপারটা বাল্মীকির অনুকরণে কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে। কৃত্তিবাস বা জগদ্রাম কেহই মূলের অনুসরণ করেন নাই; উভয়েরই রামায়ণ, ন্যূনাধিক, লোকপরম্পরাগত আখ্যায়িকার ভিত্তিতে এবং স্বকপোলকল্পনার উপকরণে গঠিত। কিন্তু কৃত্তিবাস তৎকালীন রুচি-সম্মত অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারেন নাই,—জগদ্রাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা সর্ব্বত্রই সরল ও স্বাভাবিক; এই স্বপ্নবৃত্তান্ত পড়িলেই তাহা অনেক পরিমাণে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"এমন স্বপন ভাই, আমি কভু দেখি নাই,
একি আজি দেখি নিশি শেষে।
শুন ভাই মন দিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া,
সর্ব্বনাশ হৈল বুঝি দেশে॥

---

* কবিতার তুলনা কবিতার সহিত করা সুসঙ্গত বোধে এই পদ্যানুবাদ গ্রহণ করিলাম। কৃত্তিবাসের উদ্ধৃতাংশের জন্য আমরা বটতলার নিকটে ঋণী।

সত্যবন্ধী ছিল পিতা, বর মাগি নিল মাতা,
রামে রাজা করিতে না দিলা।
শ্রীরাম বাকল পরি, চিকুরেতে জটা ধরি,
রামধন বনে প্রবেশিলা॥

লক্ষ্মণ জানকী সনে, বনে গেলা তিন জনে,
হেন কালে প্রভু মোরে কন।
শুন রে ভরত ভাই, মায়ে তোরে সঁপি যাই,
জননীর করিহ পালন॥

* * *

তাঁর শোকে সব লোকে, ভূমে পড়ি লড়ি থাকে,
হাহাকার করে প্রজাগণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা, বনে পাঠাইয়া পিতা,
শোকাকুলে ত্যজেছে জীবন॥"

স্বপ্নাবেশে অভূতপূর্ব্ব অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা নিতান্ত বিচিত্র নহে, আর সংস্কারবশে ঐরূপ দৃশ্য অশুভের নিদান বলিয়াও আমাদিগের ধারণা আছে; স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শৈবলিনীকেও আমরা অলৌকিক দৃশ্যে শঙ্কিতা হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু সত্য ও স্বাভাবিক দৃশ্যও যখন স্বপ্নের বহির্ভূত নহে, তখন জগন্নাথের উল্লিখিত স্বপ্নবর্ণনাকে সাহসপূর্ব্বক সরল ও সুন্দর বলা যাইতে পারে। তার পর দূতমুখে অযোধ্যার সংবাদ উভয় গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—

কৃত্তিবাস।

ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি॥
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।
[illegible] দেখিতে [illegible] চঞ্চল॥

জগদ্রাম ।

আরে আরে চরবর না কর উত্তর ।
কেমন আছেন মোর পিতৃনৃপবর ॥
রাম ঘনশ্যাম মোর আছেন কুশল ।
প্রাণধন লক্ষ্মণের বল সুমঙ্গল ॥
মন্ত্রিবর্গ সব প্রজা আছে আনন্দিত ।
বন্ধু বান্ধবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসি বিহিত ॥
কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে ।
তাহা দেখি ভরত বিকল হৈল শোকে ॥
কত ক্ষণ পরে পুনঃ কহে সেই চর ।
মোরে নিতা পাঠালে বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
ত্বরা করি চল ঘর শুন মোর বাণী ।
অন্য কথা বলিতে নিষেধ কৈল মুনি ॥
আর যদি কোন জিজ্ঞাসিবে বিবরণ ॥
গুরুর বচন তবে হইবে লঙ্ঘন ॥

এই স্থলে জগদ্রামকে বাল্মীকি অপেক্ষাও কল্পনাকুশল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের দোষ নাই,—তিনি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির অনুগমন করিয়াছেন; মূলগ্রন্থেও

"দূতেরা বিনীতভাবে কহিলা তখন :—
'রাজপুত্র ! যাঁহাদের তুমি এইক্ষণ
কুশল কামনা করি' করি'ছ জিজ্ঞাসা,
যাঁহাদের শুভ তব মন করে আশা,
তাঁহারা সবাই, বীর ! আছেন কুশলে ;—"

বস্তুতঃ, তখন কেহই কুশলে নাই,—জগদ্রামের ভরত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, অযোধ্যায় সেই ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে ঘটিয়াছে। কিন্তু দূত অনায়াসে মিথ্যার অবতারণা করিয়া বলিল, "সকলে কুশলে আছেন।" সত্যের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করা রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, আর সত্য রক্ষা করা প্রত্যেক সন্নীতিপরায়ণ সুকবির প্রধান কর্ত্তব্য; এরূপ অবস্থায় প্রভুর সমক্ষে ভৃত্যের এই মিথ্যা বর্ণনা বড়ই দুঃখের বিষয়। জগদ্রাম সুকৌশলে এই মিথ্যার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, অথচ প্রভুসমক্ষে অবাধ্যতাপ্রকাশরূপ পাপেও ভৃত্যকে লিপ্ত হইতে হয় নাই,—তিনি পরম গুরু বশিষ্ঠদেবের দোহাই দিয়া এক ক্ষেত্রে ভৃত্যের আজ্ঞাপালকতা এবং [illegible] পরিচয় দিয়াছেন।

গুরুর নিষেধবাণী শুনিবামাত্র ভরত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে স্থির করিলেন—

"ধাওয়াধাই যাই দেখি কি বটে কারণ।"

জগদ্রামের রামায়ণ সর্ব্বত্র এইরূপ সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন ভাবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সকল অংশের আলোচনা করা সম্ভব নহে; আমরা আর দুইটী স্থলের উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কৃত্তিবাসের শত্রুঘ্ন উদ্ধতস্বভাব, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, অর্ব্বাচীনের মত কার্য্য করিয়াছেন; তিনি কুব্জা মন্থরাকে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও তজ্জনিত পিতার মৃত্যুর কারণ অনুমান করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে দর্শনমাত্র—

"———— ————ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে যে ফেলে ভূমিতলে॥
হিছড়িয়া ল'য়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥
* * * *
চুলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥
* * * *
চুলে ধরি চেড়ীরে মাটিতে ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুদগরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা॥"

কৃত্তিবাসের শত্রুঘ্ন যখন এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও বিক্রম প্রকাশে ব্যস্ত, জগদ্রামের শত্রুঘ্ন তখন জ্যেষ্ঠ ভরতের শোকবিহ্বলতাপ্রশমনে নিরত,—তিনি

———— করপুটে বিনয়েতে বলে।
মন দিয়ে শুন দাদা বলি পদতলে॥

দৈবকালে ধৈর্য্য হ'লে তবে সে নিস্তার।
উগ্রমতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার॥

* * * *

যে কালের যে উচিত সেই সে কর্ত্তব্য।
হঠাৎকারে করে কর্ম্ম সে অতি অভব্য॥

* * * *

বিমুখ হইল বিধি, এ সব লিখিল যদি,
এ কলঙ্ক কেবা খণ্ডাইবে।
কোপ লোপ কর দাদা, ধর্ম্মে পাপ হবে বাধা,
ধর্ম্ম গেলে সজ্জন কে হবে॥
ধর্ম্মই অন্তের গতি, ধর্ম্মে বৃদ্ধি সুসন্ততি,
ধর্ম্ম করে কলঙ্ক বারণ।
ধর্ম্ম অনাথের বন্ধু, ধর্ম্মে তরে দুঃখসিন্ধু,
ধর্ম্ম হৈতে বিপাক তারণ॥
ধর্ম্ম যে ভয়েতে রাখে, পরব্রহ্ম রাখে তাকে,
ধর্ম্মের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।
ধর্ম্ম যেবা করে নষ্ট, সে পায় সতত কষ্ট,
শাস্ত্রে [illegible] শুন জ্যেষ্ঠ ভাই॥
বিষ খেতে কর সত্য, তাতে হবে আত্মহত্যা,
মারে যদি মাতৃহত্যা হবে।
যার জন্য অতিকোপে, [illegible] পাপে,
তবু রাজ্য না পাইবে॥
এ অযোধ্যা [illegible]
পিতা কোথা আছেন কি মতে।
পিতার আইলে সত্য, [illegible] মতি,
[illegible] লোকান্তরে যেতে॥

ভেবে দেখ মনে মনে, ঘনশ্যাম ঘোর বনে,
বুঝি সূর্য্যবংশ ধ্বংস হয় ॥
যুক্তি দিতে নাহি লোক, ত্যাগ কর সব শোক,
আর কি বলিব তব পায় ॥
আমি সে কিঙ্করাভাস, তোমার দাসের দাস,
তোমা বুঝাবারে কিবা ক্ষম।
ধৈর্য্য হ'য়ে কার্য্য কর, মানসে সন্তোষ ধর,
বিচারিয়ে কর উপক্রম ॥"

এতদ্দ্বারা জগদ্রামের কবিত্বে সহৃদয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুরুচিপ্রবণতাও তাঁহার কাব্যের অন্যতম লক্ষণ; অশ্লীলতাদোষে কৃত্তিবাসের গ্রন্থ অনেক স্থলে গুরুজনের নিকট অপাঠ্য, কিন্তু সুরুচিগুণে জগদ্রামের [illegible]ত ভাবে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, সকলের নিকট পাঠ [illegible] যাইতে পারে। "ভরদ্বাজাশ্রমে ভরতসৈন্যের আতিথ্যে কৃত্তিবাস কবি কি অরুচিকর ও অশ্লীল ভাব মিলিত করিয়া দিয়াছেন!" পিতৃশোকাতুর জ্যেষ্ঠের চরণদর্শনলোলুপ, কাতরপ্রাণ ভরতের সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের পরিতৃপ্তির জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের পক্ষে তদ্বর্ণিত আয়োজনও নিতান্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। সূক্ষ্মদর্শী জগদ্রাম সে স্থলে অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"শুদ্ধ জানি মহামুনি করিলা অতিথি।
সে দিবস রাখিলেন প্রীত হ'য়ে অতি ॥"

জগদ্রামের ভরদ্বাজকে কৃত্তিবাসের ভরদ্বাজের ন্যায় অতিথিসেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাদি দেবগণের কৃপা ভিক্ষা করিতে হয় নাই, তদ্বর্ণিত ভরতের সৈন্যগণও এক রাত্রির জন্য পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই। তাহারা পবিত্র তাপসের পবিত্র আশ্রমে কোনরূপে রাত্রিযাপন করিয়া—

"প্রভাতে উঠিয়া যান রামের নিকটে।"

জগন্নাথের কীর্ত্তির, ও তৎসঙ্গে লুপ্ত 'পাক্ষিক সমালোচক' পত্রের ও স্বর্গীয় শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতি উজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা করি, ইহাতে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিব।

কবিরঞ্জন।

[তদীয় রচনার অনুক্রম]

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ অধুনাতন কাব্যরচয়িতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ কাব্য রচনা করেন, মুদ্রাকরের কৃপায় তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়, পরন্তু তাঁহাদিগের রচিত খণ্ড কবিতাগুলিরও নিম্নে, অধিকাংশ স্থলে, রচনাকাল লিপিবদ্ধ থাকায় সেই সকল রচনার পারম্পর্য্যনিরূপণে ও সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবোন্মেষের ক্রমোন্নতি অবধারণে যথেষ্ট সুবিধা হয়। এই সুযোগেই 'ভানুসিংহের পদাবলী' কিরূপে 'গীতালি' বা 'গীতাঞ্জলি'তে পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিংবা 'আর্য্যগাথা' কিভাবে 'মন্ত্র'ধ্বনিতে বা মাতৃসঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, রসজ্ঞ পাঠক তাহার ক্রমনির্ণয়ে সমর্থ হয়েন। প্রাচীন কাব্যসমূহে ঐরূপ তথ্য নির্ণয়ের জন্য, কচিৎ ভণিতাপ্রসঙ্গে কাব্যকালের আভাস পাওয়া ভিন্ন, অধিকাংশ স্থলেই অনুমান বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

বড় বেশীদিনের কথা নহে, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী ও কবিতামালার রচনাপারম্পর্য্যনির্ণয়েও পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে, তাঁহার সাংসারিক অভাবক্লিষ্ট মুহুরিগিরির অবস্থাতে হিসাবের খাতায় তদ্রচিত অনুপম সঙ্গীত "আমায় দে, মা, তবিলদারী" পাঠ করিয়া তাঁহার সহৃদয় গুণগ্রাহী অন্নদাতা পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রসাদের সাধনাকুল চিত্তকে অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার উদ্দেশে "স্বীয় বদান্যতা ও উদারতাগুণে" তাঁহার জন্য "যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া" দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে শক্তিসাধনায় ব্যাপৃত থাকা অবস্থায়

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির ও সেই ভক্তিপ্রণোদিত সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সেই গুণের পুরস্কারস্বরূপ 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলে, রামপ্রসাদ না-কি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'বিদ্যাসুন্দর' প্রণয়ন করিয়া মহারাজাকে উপহার দেন! বিষয়বাসনা-পরিশূন্য, শক্তিসাধনায় একনিষ্ঠ, রামপ্রসাদ এই অবস্থায়,

"এমন কল ক'রেছে কালী,—বেঁধে রাখে
মায়া পাশে"—

সংসারাসক্তির এবংবিধ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও, 'বিদ্যাসুন্দর' ভিন্ন মহারাজার উপহারযোগ্য গ্রন্থরচনার অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, একথা বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তবে, সংসর্গদোষ একরূপ অপরিহার্য্য,—"যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই"। * রামপ্রসাদ ইহার অন্যতম সাক্ষী। সে যাহা হউক, এই 'বিদ্যাসুন্দরে'র উপসংহারভাগেই কবির বংশ-পরিচয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তন্মধ্যে

"শ্রীকবিরঞ্জনে, মাতা, কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে, মা গো, দেহ পদধূলি॥—"

এইরূপ ভণিতা থাকায় ঐ গ্রন্থ যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক 'কবিরঞ্জন' উপাধিপ্রদানের পরে রচিত, তৎপক্ষে সন্দেহ থাকে না।

'বিদ্যাসুন্দর' ব্যতীত 'কালীকীর্ত্তন', 'কৃষ্ণকীর্ত্তন', 'সীতাবিলাপ' প্রভৃতি 'প্রসাদ-রচিত' আর কয়েকখানি খণ্ডকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ; 'সীতাবিলাপ'ও প্রায় তদ্রূপ ক্ষুদ্র, তবে তাহা ভণিতাযুক্ত বটে—

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ। ৩৮১ পৃঃ।

"রামপ্রসাদ কহিছে শুন, মা জানকি,
রামের মহিমা, মাতা, তুমি না জান কি?"

এসকল খণ্ডকাব্য তাঁহার 'কবিরঞ্জন' উপাধিলাভের পূর্ব্বেই রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'কালীকীর্ত্তন' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; ইহার মধ্যে কোন কোন পরিচ্ছেদে মাত্র 'প্রসাদ', কোথাও 'শ্রীরামপ্রসাদ,' কোথাও 'কবি রামপ্রসাদ,' ইত্যাকার ভণিতা দেখা যায়,—আবার অনেক স্থলে "দাস প্রসাদ বলে", "কবি রামপ্রসাদ দাসে", "দীন প্রসাদ দাস," "শ্রীরামপ্রসাদ দাসে," "ভণে রামপ্রসাদ দাস," এইরূপ 'দাস' যুক্ত ভণিতা আছে। এই 'দাস' সর্ব্বত্র কেবল দীনতাজ্ঞাপক বলিয়া বোধ হয় না,—তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, "দীন প্রসাদ দাস"। বৈদ্যবংশে 'দাস' উপাধি বর্ত্তমান বটে,* কিন্তু সেন-(গুপ্ত) ও দাস-(গুপ্ত) সম্পূর্ণ পৃথক্ পদবী—এ অবস্থায় কবি রামপ্রসাদ 'সেন' কেন 'দাস' বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, ইহাও বুঝা সুকঠিন। এক্ষেত্রে দাসোপাধিধারী অপর কোন রামপ্রসাদ 'কালীকীর্ত্তন'এর রচয়িতা বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে; কিন্তু উহার দুই পরিচ্ছেদে— "কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন" এবং

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এইরূপ 'কবিরঞ্জন' ভণিতা দেখা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ উত্থাপনের কোন কারণ থাকে না, পরন্তু এই কাব্যও যে কবির স্বগৃহে অবস্থানকালে নবদ্বীপাধিপতির অনুগ্রহলাভের পরে রচিত, ইহাও প্রতীত হয়।

যাহাহউক, উপরিলিখিত কাব্য কয়েক খণ্ডের দ্বারা কবিরঞ্জনের

---

* অধুনা অনেকস্থলে ঐ উপাধি 'দাশ' শব্দে রূপান্তরিত দেখিতে পাই। কিন্তু এই রূপান্তরের কর্ত্তা কে, আমরা অবগত নহি। প্রচলিত কোন কোষগ্রন্থে ঐ দুই রূপের অর্থগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না, পরন্তু 'বাঙ্গালা-শব্দ কোষে' ঐ রূপ বা উহার তথ্য খুঁজিয়া পাই নাই।

কবিত্বের বিচার চলে না,—বস্তুতঃ প্রসাদের 'পদাবলী'ই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি সঞ্জীব রাখিয়াছে, আর যতদিন বঙ্গভাষায় জীবনীশক্তি থাকিবে, ততদিন সেই স্মৃতি অটুট রহিবে। এই পদাবলী রচনার ক্রমপরম্পরা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। সচরাচর সংগ্রহগ্রন্থে রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া যে সমস্ত পদ দেখা যায়, তন্মধ্যে অনেকগুলি ভণিতাশূন্য এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নানাবিধ জঙ্গলা সুরে গ্রথিত। প্রসাদের পদাবলী যেমন অনুপম, প্রসাদী সুরও সেইরূপ স্বতন্ত্র; এজন্য এই মণিকাঞ্চনসংযোগের ব্যতিক্রম দেখিলে তাহা প্রসাদী পদ বলিয়া গণ্য করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এইরূপ ভণিতাহীন বা জঙ্গলা সুরের গানের মধ্যে—

"(আমায়) ছুঁয়োনা, রে শমন, আমার জাতি গিয়েছে।
যেদিন কৃপাময়ী মা আমায় কৃপা করেছে॥"

* * * * *

"তিলেক দাঁড়া, ওরে শমন, বদন ভ'রে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসেন, কি না আসেন, দেখি॥"

* * * * *

"(ওরে!) সুরাপান করিনে আমি,—সুধা খাই 'জয় কালী' ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,—যত মদ'-মাতালে মাতাল বলে॥"

* * * * *

"মা! মা!' ব'লে আর ডাক্‌ব না।—
তুমি দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।"

* * * * *

"এমন দিন কি হ'বে তারা—
যবে 'তারা! তারা! তারা!' বলে
তারা বেয়ে প'ড়বে ধারা?"

* * * * *

"তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্নি সুখ কি দিবে পাছে

শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি, মা, তোমার সাধি,

* * * * *

ওমা! আমার দফা হ'ল রফা,—দক্ষিণা হ'য়েছে।"—

প্রভৃতি গান অবিসংবাদে রামপ্রসাদের বলিয়া পরিচিত। অতএব স্বকীয় সুর ভিন্ন তিনি দেশপ্রচলিত অন্যান্য সুরেও যে গান রচনা করিতেন, এবং কচিৎ কোন কোন গানে যে ভণিতাসংযোগ করেন নাই, বা ভণিতাযুক্ত অংশ সংগৃহীত হয় নাই, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্যামাপূজার পরদিবস প্রতিমাবিসর্জ্জন-কালে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, উপরি-উদ্ধৃত শেষ গানের শেষ চরণ—"আমার দফা হ'ল রফা, দক্ষিণা হ'য়েছে"—গগনভেদী তারস্বরে গাহিতে গাহিতে প্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অতএব ঐ গানই তাঁহার রচিত শেষ গান বলিয়া অনুমান করিতে হয়। সেইরূপ, কলিকাতায় অবস্থানকালে মুহুরিগিরির অবস্থায় হিসাবের খাতায় লিখিত "আমায় দে, মা, তবিলদারী" গানটীই প্রথমে তাঁহার প্রভুপ্রমুখ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার অপর দুই গানে—

১। "দীন রামপ্রসাদ বলে * * *
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,—
আপন ঘরে যায় যে চুরি।"

২। "কার বা চাকুরী কর?—
ওরে! তুই বা কে, তোর মনিব
কে রে!—হলি কার নফর?"—

পরের ঘরে চাকরি করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আপন গৃহে স্বাধীন ভাবে শক্তিসাধনা ও সঙ্গীতরচনাকালে প্রসাদের মনে উল্লিখিত ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব বোধ হয় না; প্রত্যুত, এগানও তাঁহার মুহুরিগিরির অবস্থায় হিসাবের খাতায় লিখিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপে আদি-অন্তের সিদ্ধান্ত করিলে মধ্যভাগে যাহা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা. আগমনী, বিজয়া, পরন্তু "আসব-আবেশে * নবীনা নগনা লাজবিরহিতা * * বিপরীত ক্রীড়াতুরা * * এলোকেশী * * ভৈরবী * * রণরঙ্গিণী" মূর্ত্তির বর্ণনা ও অপর নানাবিষয়ক সঙ্গীত মিলে। এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব এই. কচিৎ 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত হইলেও, ইহার কোনটাই প্রায় 'প্রসাদী সুরে' রচিত নহে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, সাধারণ শক্তিবাদিগণের ন্যায় দেশাচারসম্মত তান্ত্রিক বা পৌরাণিক ভাবের রচনাতে রামপ্রসাদ দেশপ্রচলিত নানাবিধ সুরের সহায্য লইতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বত-উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গ আপন সুরেই প্রকাশ পাইত; আর সেই অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই প্রসাদ-পদাবলীর অবিনশ্বরত্ব। ভাবের ভরে তিনি 'তবিলদারী' হইতে সূত্রপাত করিয়া কখন 'কলুর বলদ' সাজিয়াছেন,—কখন 'কৃষিকাজ' করিয়াছেন,—কখন 'ভূতের বেগার' খাটিয়াছেন,—কখন দাবা, কখন পাশা, কখন দাঁড়া-গুলি, কখন বা কেবল ধূলা খেলিয়াছেন, কখন "জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়" ভাবিয়া ভয় পাইয়াছেন,—কখন (ভবসংসার-বাজার মাঝে) মা'র ঘুড়ি উড়ান দেখিয়াছেন,—কখন আসামী, কখন ফরিয়াদী, হইয়া মার সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়াছেন;—কখন 'মনপাখী'কে 'পড়া' শিখাইয়াছেন,—কখন 'তারা তরি' অবলম্বনে ভবপারে যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন,—আবার কখন একাগ্রচিত্তে বলিয়াছেন—

"মন রে! শ্যামা মাকে ডাক,—
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।।

রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা, ত্যজ শঙ্কা, দূর হবে কর্ম্ম ফাঁক।"

যাহাহউক, সাধনতত্ত্ববর্ণনই তাঁহার পদাবলীর পরম লক্ষ্য। বস্তুতঃ

দমন এই সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র. আর ঐ ছয়টা রিপুর ভয়ে যে তিনি অনুক্ষণ চিন্তাকুল, উপরি-উদ্ধৃত গানে আভাস পাওয়া ভিন্ন, প্রসাদের অনেক পদেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বলদ' অবস্থায় তিনি অনুযোগ করিতেছেন—"(মাগো !) তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত ?"—"হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে, 'কালী' ব'লে, ডুব" দিবার সময়ে ভাবিতেছেন, সেই রত্নাকরে—"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, (তা'রা) আহার লোভে সদাই চলে।" এজন্য মনকে উপদেশ দিতেছেন—

> "তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
> ছোঁবে না তা'র গন্ধ পেলে।"

ভাঙ্গা ঘরে বসতি করায় বড়ই ভয়, পাছে—

> "রাত্রে এসে ছয়টা চোরে কেটে দেওয়াল
> ডিঙ্গিয়ে পড়ে।"

মজুরদারি প্রসঙ্গে চিন্তা করিতেছেন, "** ছয়টা রিপু ** মহা লেঠে।" আবার মা'র কাছে মোকদ্দমা করিতে গিয়া কাতরভাবে বলিতেছেন—

> "এক আসামী ছয়টা প্যাদা,—বল্, মা,
> কিসে সামাই করি।
> আমার ইচ্ছা করে,—ঐ ছটাকে বিষ
> খাইয়ে প্রাণে মারি॥"

পুনশ্চ, মনের দাণ্ডা-গুলি খেলা অকালে ভঙ্গ হওয়ায় আক্ষেপ জন্মিয়াছিল—

> "ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল
> ভুলে গেলি,"

তাই নৃত্যকালীকে "মনোযন্ত্রে বাদ্য করি', হৃদি-পদ্মে নাচাইব" মানস করিয়া বলিতেছেন—

> "আছে আর যে ছটা বড় চাটা,—
> সে ক'টাকে কেটে দিব।"

রিপুভয়ের ন্যায় যমের ভয়ও রামপ্রসাদের মনকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। সেই ভয়ের আবেগে তিনি কখন ভাবিতেন—

"যমদূত আসি', শিয়রেতে বসি', ধ'রবে
　　　　যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী-কাচা, বিদায়
　　　　দিবে দণ্ডী-বেশে॥"

কখন বলিতেন,—

"যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে ক'সে মন,
　　　　কোথা র'বে খুড়া জ্যেঠা।
মরণ-সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসী,
　　　　ছেঁড়া চ্যাটা।"

কিন্তু নিরন্তর মা'র নাম জপে, মা'র মূর্ত্তি ধ্যানে, মা'র প্রতি অটল বিশ্বাস-বলে, তিনি সহজেই সে ভয় দূর করিয়া ফেলিতেন, আর মনকে প্রবোধ দিতেন,—

"ভবে এসে ভাব্‌ছ ব'সে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
ওরে! কালের কাল মহাকাল,—সে
　　　　কাল মায়ের পদানত॥"

*　　*　　*　　*

"হাতে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধ্‌বে ক'সে, সেই
　　　　কালী তা'র মুখে দিব॥"

*　　*　　*　　*

"যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যা'ব।
আমার ভয় কি তাতে?—'কালী' বলে
　　　　কালেরে কলা দেখা'ব॥"

*　　*　　*　　*

"অভয় পদে প্রাণ স'পেছি,—
আমি আর কি যমে ভয় রেখেছি"।

* * * *

"যখন শমন ধ'রবে আসি, ডাক্‌ব 'কালী কালী' ব'লে।"

পরন্তু, যমদূতকে বা স্বয়ং যমকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেন,—

"আমার সনদ দেখে যা' রে!
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল্‌ গে যা' তোর যমরাজারে।"

* * *

"দূর হ'য়ে যা', যমের ভটা,—
ওরে! আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
ব'ল্‌ গে যা' তোর যমরাজারে,—
আমার মত নি'ছে ক'টা?—
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাব্‌লে
ব্রহ্মময়ীর ছটা।"

* * * *

যা', রে শমন! যা' রে! ফিরে,—
তোর যমের বাপের কি ধার ধারি?
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী,—দেখ্‌ মা
চেয়ে—শুভঙ্করী।"

* * * *

"ওরে শমন! কি ভয় দেখাও মিছে?
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে
তোরে অভয় দেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনকে সদাই সতর্ক করিতেন,—

"কেন, মন, এত ভুল?
ওরে! কালী' যার অন্তরে রণ—
কেন অকল্যাণ হবে।"

আর একমনে কাতর প্রাণে মা'র কাছে প্রার্থনা করিতেন,—

"যেন অন্তকালে তনু আমার টেনে ফেল গঙ্গাজলে।"

* * *

"যেন অন্তিমকালে 'দুর্গা' ব'লে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।"

সম্প্রতি আমরা নবকুমার শর্ম্মার মুখে শুনিয়াছি,—"যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" * ইহার অনেক পূর্ব্বে রামপ্রসাদ শুনাইয়াছেন—

"নানা তীর্থপর্য্যটন শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পা'বে ঘরে ব'সে চারি ফল,—বুঝ না, রে ক্ষেপচেটে!"

একদিন মাত্র তাঁহার মনের সাধ শুনি বটে,—

"আমি ক'বে কাশীবাসী হ'ব?—
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।"

আর একদিন তাঁহাকে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুনা যায়,—

"আমি ঐহিক সুখে মত্ত হ'য়ে যে'তে নারলাম বারাণসী।"

নচেৎ সকল সময়েই তাঁহার সেই এক কথা—

"প্রসাদ বলে, কি ফল হ'বে, হই যদি গো কাশীবাসী?"

* * * *

"কাজ কি রে মন! গিয়ে কাশী?—
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।"

* * *

"কাজ কি তীর্থ গয়া কাশী,
যা'র হৃদে জাগে এলোকেশী

* * *

"কেন গঙ্গাবাসী হ'ব?—
ঘরে ব'সে মা'র নাম গাহিব,—

* * *

---

* কপালকুণ্ডলা। প্রথম খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীর চরণতলে কত শত গয়াগঙ্গা

দেখতে পা'ব।"

*   *   *   *

"তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,

মন উচাটন ক'র না রে!"

*   *   *

"আর কাজ কি আমার কাশী

ওরে! কালীর পদকোকনদে তীর্থ রাশি রাশি।

*   *   *   *

গয়ায় ক'রে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ ;—

ওরে! যে করে কালীর ধ্যান,

তা'র গয়া শুনে হাসি।

কাশীতে ম'লেই মুক্তি,—এ বটে শিবের উক্তি ;—

ওরে! সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তা'র দাসী।"

আর অন্তিমেও সেই একমাত্র উপায় স্থির—

"এ সংসারে আসি', আমি না করিলাম গয়াকাশী,—

যখন শমন ধ'র্‌বে আসি'—

ডাক্‌ব 'কালী কালী' ব'লে।"

পারলৌকিক কল্যাণকামনায় তীর্থপর্য্যটন নিরর্থক ভাবিলেও, প্রসাদ স্বয়ং সাধনপ্রণালীর কোন নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করেন নাই, গুরুদত্ত তত্ত্বেই তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহার মুখে সদাই শুনিতে পাওয়া যায়,—

"রামপ্রসাদ বলে,—

হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা।"

*   *   *

"ওরে মন! গুরুদত্ত তত্ত্ব কর,—

কি করিবে রবিসুত ?"

"গুরুদত্ত মহাসুরা
　　　　ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।"

*　　　*　　　*　　　*

"গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে,
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটি,
পান করে মোর মন-মাতালে।"

*　　　*　　　*　　　*

"গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধ রে!
　　　　　　　　যতনে ক'সে।"

*　　　*　　　*　　　*

"গুরুদত্ত রত্নভরে কেন ব্যাপার না করিলি?"

*　　　*　　　*　　　*

"(আমি) জানাইব কেমন ছেলে,
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ
গুজরাইব মিছিলকালে॥"

*　　　*　　　*

"গুরুদত্ত বীজ বপন ক'রে,
ভক্তি-বারি তায় সেচ না।"

*　　　*　　　*

"আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পা'ব
　　　　　　　　রাশি রাশি।"

*　　　*　　　*　　　*

"যে ধন দিলেন কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র,—
তা'ও হারালায় সাধন বিনে॥"

সেই গুরুদত্ত মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রামপ্রসাদ নিরন্তর নামজপে নিরত থাকিতেন,—

"মুখ গুরুদত্ত মন্ত্র করি' দিবানিশি জপ করে।"

আর মনকে উদ্বোধিত করিতেন,—

"মন রে! কবে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পা'বি—
ডাক সদা কেলে মা'রে।"

* * *

"প্রসাদ বলে—দুর্গানাম জপ, মন, অবিরাম।"

এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আনুষ্ঠানিক "সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা",—তিনি সাধনকল্পে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন,—

"শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

নামজপে সিদ্ধ হইয়া রামপ্রসাদ শক্তিস্বরূপিনী জগৎপ্রসবিনী মা'র সহিত এতই আত্মীয়তা সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, সন্তানের ন্যায় সরল প্রাণে, সদাই তাঁহার কাছে আবদার ও অভিমান প্রকাশ করিতেন;—

"বল্, মা তারা, দাঁড়াই কোথা?
তুমি না করিলে কৃপা, যা'ব কি বিমাতা যথা?
ওমা, যেজন তোমার নাম করে,
তা'র হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা!"

* * *

"অভয় পদ সব লুটা'লে—
কিছু রাখ্‌লি না, মা, তনয় ব'লে।
জন্ম-জন্ম-জন্মান্তরে কতই দুঃখ দিয়েছিলে।
রামপ্রসাদ বলে,—এবার ম'লে ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী ব'লে।"

* * *

"আমি তাই অভিমান করি,—
আমার ক'রেছ, গো মা, সংসারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে, মা, কেন এত হ'লে ভারি?
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি।"

* * *

"যাও, গো জননি! জানি তোরে,—
তা'রে দেও দ্বিগুণ সাজা, মা,

যে তোমার খোসামুদি করে।
'মা ! মা !' ব'লে পাছু পাছু
যেজন স্তুতি-ভক্তি করে,
দুঃখে শোকে দগ্ধে তা'রে,
দাখিল করিস্ যমের ঘরে"

* * *

"আমি নই পলাতক আসামী ;—
ওমা ! কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ?
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু মাঝে,
ডুবেও পদে হ'ব হামি "।

প্রসাদের মা'র কা'ছে এই আবদারে, পরন্তু তাঁহার পদাবলীমাত্রে, ভক্তির ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ, মুক্তির পথে ভক্তিই তাঁহার সার ধর্ম্ম ; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দানধর্ম্মোপরি,"
(কিন্তু) "মন ! ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া।"

* * *

"ওমা ! শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে
মুক্তি জলে টেনে ফেল।"

তবে, তিনি অন্ধ ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া কর্ম্মে বিমুখ নহেন ; প্রত্যুত, তাঁহার বিশ্বাস—

"কর্ম্মসূত্রে মা' আছে, মন,
কেবা পা'বে তা'র বাড়া।"

* * *

"যা'র যেমি কর্ম্ম, তেমি ফল,—
কর্ম্মফল ক'লে আছে।"

এজন্য তিনি মনকে নিয়তই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন—

"প্রসাদের মন হও যদি, মন,
কর্ম্মে কেন হও রে! চাষা?—
ওরে! মনের মতন কর যতন,
রতন পা'বে অতি খাসা।"

ভক্তিতত্ত্বের অধীন রামপ্রসাদ এ অবস্থায় দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী,—'সোঽহং' ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না,—'নির্ব্বাণ' অবস্থা তাঁহার আদৌ কামনীয় নহে—

"প্রসাদ বলে,—ভক্তের আশা—
পুরাইতে অধিক বাসনা;—
সাকারে সামীপ্য হবে—
নির্ব্বাণে কি ফল বল না?"

* * *

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল?—
জলেতে মিশায় জল।
ওরে! চিনি হওয়া ভাল নয়;—
চিনি খেতে ভালবাসি।"

কিন্তু "বল্ দেখি, ভাই, কি হয় ম'লে?"—এই মহা সমস্তার সমাধানকল্পে এ সম্বন্ধে তাঁহার মতভেদ লক্ষিত হয়,—তখন

"প্রসাদ বলে, যা' ছিলি, ভাই, তাই হ'বি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হ'য়ে সে মিশায় জলে॥"

এস্থলে তাঁহাকে ঘোর অদ্বৈতবাদী বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদসূচক আরও অনেক পদ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদ তাঁহার এই গীতটীতে মানুষের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অনেক অবস্থার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জন্মান্তরের কথা উত্থাপিত করেন নাই। তাই বলিয়া তিনি যে জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না, এমন আভাস পাওয়া যায়

না; প্রত্যুত, পূর্ব্বোক্ত এক গীতে আমরা তাঁহার মুখে স্পষ্টই শুনিয়াছি—

> "জন্ম-জন্ম-জন্মান্তরে কতই দুঃখ দিয়েছিলে।
> রামপ্রসাদ বলে,—এবার ম'লে ডাকব সর্ব্বনাশী বলে॥"

ইহাতে বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া শেষ মৃত্যুর পরে, জলের সহিত জলবিম্ব বিলীন হওয়ার ন্যায়, জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়—রামপ্রসাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবীজ ও তাহার ফলাফল বিষয়ক মতের সহিতও অসঙ্গতি জন্মে। অথবা, ইহা তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে মতভেদের পরিচয়।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও, আধুনিক শাক্ত-বৈষ্ণবের ন্যায়, প্রসাদের মনে শক্তি-বিষ্ণুর মধ্যে ভেদজ্ঞান বা পরস্পর কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না, * প্রত্যুত, তিনি নির্ব্বিকল্প চিত্তে বলিতেন,—

---

* শক্তি-বিষ্ণুর মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষভাব না থাকিলেও, চৈতন্যপন্থী নেড়া-নেড়ীর দলের প্রতি রামপ্রসাদের বিলক্ষণ বিদ্বেষভাবের লক্ষণ বুঝা যায়। 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে চৌরান্বেষণে কোতোয়ালচরসমূহের ছদ্মবেশধারণ প্রসঙ্গে তিনি ঐ দলের এইরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন—

> "গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
> সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
> খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
> চিকণ গুদড়ী গায় বাঁকা কোৎকা হাতে॥
> মুক্ত-গুচ্ছ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব।
> দুই ভাই ভজে তারা দণ্ডিছাড়া ভাব॥
>
> * * * *
>
> [illegible] এক [illegible] [illegible] ঝুটি ঝুটি।
> দুই চক্ষু লাল [illegible] [illegible] [illegible]॥"

"মন ক'র' না দ্বেষাদ্বেষি, * * *
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—
সকল আমার এলোকেশী।

* * *

প্রসাদ বলে,—ব্রহ্মনিরূপণের কথা—
(সে কেবল) দেঁতোর হাসি। আমার ব্রহ্মময়ী
সকল ঘটে,—পদে গঙ্গা গয়া কাশী।"

* * *

"উপাসনাভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক ক'রে ভাবে,
তা'র হাতে, মা, কোথা বাঁচ?

* * *

প্রসাদ ভণে, অভেদ জ্ঞানে
কালরূপে মেশামেশি।
ওরে! একে পাঁচ, পাঁচেই এক,—
মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষি॥"

মাতৃমন্ত্রে একদিন আমরা শুনিয়াছিলাম—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জাপুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"

আর এখনও কাণে বাজিতেছে—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

রামপ্রসাদও সেই সুরে সুর মিশাইয়া শুনাইয়াছেন—

"তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা! তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি,—শিব বলেছে'।
ওমা! তুমি দুঃখ, তুমি সুখ,—চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥"

মাতৃভাবে রামপ্রসাদ কোন্ পরমতত্ত্বের অন্বেষক, তিনি তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"প্রসাদ বলে,—মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা—চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি—
বুঝ্‌বি, রে মন, ঠারেঠোরে।"

* * *

"মায়াতীত নিজে মায়া,
উপাসনা হেতু কায়া।"

* * *

"মায়ীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা,—
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা।"

* * *

"(আমার) এমন দিন কি হ'বে তারা!
(যবে) ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,—
ওরে! তারা আমার নিরাকারা।"

ভাবের ভরে, এই অবস্থায়, তিনি [illegible] মনকে বুঝাইতে থাকেন,—

"মন! তোমার এই [illegible]—
কালী কেমন, তা' চেয়ে দেখ্‌[illegible]।

ওরে! ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তা' জান না?—
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে, মন, তাঁ'র
ক'র্‌তে চাও রে উপাসনা!
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন-সোণা,—
ওরে! কোন্ লাজে সাজাতে চা'স্ তাঁয়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
সুমধুর খাদ্য নানা,—
ওরে! কোন্ লাজে খাওয়া'তে চা'স্ তাঁয়
আলো চা'ল আর বুট-ভিজানা?
জগৎকে পালি'ছেন যে মা
কত যত্নে—তাও জান না?
ওরে কেমনে বলি চা'স্ দিতে তাঁয়
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা?"

তখন আমাদিগের ন্যায় মোহান্ধেরও চক্ষু ক্ষণেকের জন্য উন্মীলিত হয়, আর তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বার বার নমস্কার করি।

৩। ভক্তিপ্রসঙ্গ—

ভগবানে ভক্তি।

[প্রভাস মিলন।]

দেশমাতৃকায় ভক্তি।

[কমলাকান্ত।]

ভগবানে ভক্তি।

[প্রভাস-মিলন।]

"কৃষ্ণ-চরিত্র" অদ্ভুত কৌশলজালে জড়িত, বিচিত্র লীলায় বিচিত্র মূর্ত্তিতে অঙ্কিত। কোথাও তিনি ননী-মাখন চুরি করিয়া গোপগৃহে উৎপাত করিতেছেন; কখন রাখালবালকদিগের সহিত যথা-তথা ধেনু চরাইয়া, গোষ্ঠলীলা খেলিতেছেন; কখন বেণু বাজাইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগের সঙ্গে কদম্বমূলে, যমুনা জলে, কেলি করিয়া কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে 'শঠ-কপট-লম্পট'তার চূড়ান্ত ভাব দেখাইতেছেন; আবার কখন বা স্মরগরলে জর্জ্জরিত হইয়া উদাস প্রাণে কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার চরণতলে বসিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া দুর্জ্জয় মানভঞ্জন করিতেছেন। কোথাও তিনি স্বহস্তে পূতনা-নিধন, কংসসংহার ও শিশুপাল বধ করিতেছেন; কোথাও অদ্ভুত কৌশলচক্রে নিজ বংশ ধ্বংস পূর্ব্বক ক্ষয়-বৃদ্ধির গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া, সাম্যের সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিভাত করিয়া, অদ্ভুত সংসারতত্ত্বজ্ঞের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন; আবার কোথাও স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্জ্জয় কুরুকুল নিধন দ্বারা "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়:"—এই পবিত্র সত্য প্রচার করিতেছেন. এবং কৌশল ও মন্ত্রণাবলে অপূর্ব্ব রাজনীতিবিশারদের নিদর্শন দেখাইতেছেন। আবার কখন বা তিনি অসংখ্য সৈন্যসঙ্গমে মহান্ সমরক্ষেত্রে সারথিরূপে আবির্ভূত হইয়া, এক নিশ্বাসে বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-পুরাণাদি মন্থনপূর্ব্বক, কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অপূর্ব্ব যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন; এবং

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"

* * *

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

বলিয়া, স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল, জগতের একমাত্র শরণ্য ও উপাস্য ঈশ্বররূপে পরিচয় দিতেছেন। ফলতঃ, তিনি কোথাও অশান্ত গোপবালক, কোথাও একান্ত প্রেমবিতরক, কোথাও দুর্দ্দান্ত সমরপরিচালক, কোথাও চূড়ান্ত সমাজ-নিয়ামক, আবার কোথাও অনন্ত বিশ্ব-ব্যাপক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধক। আমরা তাঁহার চরিত্রের যে অঙ্গ দেখি, তাহাতেই কেমন অভূতপূর্ব্ব অভিনবত্ব দেখিতে পাই।

একই কৃষ্ণের এই বৈচিত্র্যময় চরিত্র কি না, এবং এই সকল কৃষ্ণ এক সময়ের কি না, প্রত্যুত কৃষ্ণ নামক কোন জীব জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, নিরূপণ করা দুরূহ। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবত—এই চারি গ্রন্থেই প্রধানতঃ কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ মন্থন করিয়া, কৃষ্ণচরিত্রের সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না। অতুল প্রতিভাসম্পন্ন পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন,—বিদ্যানন্দ দামোদর বাবুও কৃষ্ণচরিত্রের অন্য ভাব বঙ্গীয় পাঠককে বুঝাইয়াছেন। যেনি যে ভাবেই দেখুন, কৃষ্ণচরিত্র অনুশীলন করিলে, তাঁহাকে এক মহান্ "আদর্শপুরুষ", পরন্তু প্রত্যক্ষ ঈশ্বরাবতার, বলিয়া বোধ হয়। এই কৃষ্ণকে লইয়া কত লোক কত ভাবেই 'নাড়া-চাড়া' করিতেছেন—'অধিকারী' যাত্রা গাহিতেছেন, রঙ্গভূমি রঙ্গ দেখাইতেছেন, আখ্‌ড়াধারী সংকীর্ত্তন করিতেছেন, বিলাসিনীরা 'টপ' গাহিতেছেন, চিত্রকর চিত্র আঁকিতেছেন, কারিকর মূর্ত্তি গড়িতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব লোপ পায় নাই। যখনই যেভাবে যেদিকে দেখি, তাঁহার রূপচ্ছটায় মুগ্ধ হই—তাঁহার গুণগানে, তাঁহার প্রেমসংকীর্ত্তনে, বিভোর হইয়া যাই।

"প্রভাস-মিলন" এই কৃষ্ণলীলান্তর্গত একটা স্মৃতিবিমোহন ঘটনা। ব্রজের কানাই ব্রজের প্রেমে আত্মহারা—ভক্তাধীন ভক্তের ভক্তিডোরে

অনুক্ষণ বাঁধা। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার প্রেম-ভক্তির লীলাক্ষেত্র; সেই লীলাক্ষেত্রে তিনি অনুক্ষণ ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিতেন। বিরহ ব্যতীত মিলনের সুখ বুঝা যায় না; দুঃখ ব্যতীত সুখের কল্পনা মনোমধ্যে স্থান পায় না; অমাস্কার ব্যতীত শারদ পূর্ণেন্দুর অমৃতধারার প্রকৃত রসাস্বাদ অনুভূত হয় না;—জগতে এই মহা সত্য বুঝাইবার নিমিত্ত, মহাপুরুষ ভক্তিপরীক্ষাচ্ছলে, বিরহ-মিলনের, কঠোর-কোমলের, শীতোষ্ণের, ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন—নন্দ-যশোদার, শ্রীদাম-সুবলের, বৃন্দা-রাধিকার অবিচ্ছেদ প্রেম-বাৎসল্যে ক্ষণিক বাহ্য বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন। "নন্দ-বিদায়ে" এ বিচ্ছেদের উৎপত্তি, "প্রভাস-মিলনে" উহার পরিসমাপ্তি। কৃষ্ণলীলার এই দুই অঙ্গ অপরূপ কারুণ্যরসে আপ্লুত; এ কাহিনী পাঠ করিলে বা ইহার গল্প শুনিলে মন সহজেই বিগলিত হয়। আর ইহার জীবন্ত অভিনয় দেখিলে, মন আপনা ভুলিয়া ক্ষণেকের জন্য চিদানন্দের বিমল প্রেমসলিলে ভাসিয়া যায়।

প্রকৃত প্রেমিকের পক্ষে বাহ্য বিচ্ছেদ অকিঞ্চিৎকর, তিনি দিবানিশি শয়নে স্বপনে তাঁহার প্রণয়িনীর মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পান, তাঁহার রূপ-চিন্তায় তিনি অনুক্ষণ মগ্ন থাকেন; প্রকৃত ভক্ত সাধকও তাঁহার সাধনার ধন অনুক্ষণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, অন্তরাকাশে তাঁহার উপাস্য দেবতার অনিন্দ্য মাধুরী প্রতিনিয়ত প্রতিভাত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তিনি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সমভাবে তাঁহার দেবতার চরণ জড়াইয়া থাকেন; সুখের সময় তাঁহার গুণগানে উন্মত্ত হ'ন, দুঃখের সময় তাঁহার নাম-ধ্যানে মনের সন্তাপ দূর করেন—তিলার্দ্ধকাল তিনি তাঁহাকে অন্তরের অন্তরাল করিতে দেন না। ব্রজধামের সকলেই সেইরূপ পরম ভক্ত; শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে থাকিতে তাহারা কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু জানিত না—যশোদা কৃষ্ণকে নবনী খাওয়াইতেন, নন্দরাজ কৃষ্ণের মস্তকে 'বাধা' বহাইতেন, রাখালবালকগণ কৃষ্ণসঙ্গে গোচারণ করিতেন, গোপাঙ্গনারা সর্ব্বত্র কৃষ্ণসঙ্গে

বিহার করিতেন, আর ভক্তিময়ী রাধা কুল-মান্ বিসর্জ্জন দিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসঙ্গে রসতরঙ্গে বিভোর থাকিতেন। কৃষ্ণের বিচ্ছেদেও সকলে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চাহিত না, তৃষাতুর চাতকের মত সকলেই কৃষ্ণদর্শনার্থ কাতর হইয়া বেড়াইত; কৃষ্ণবিরহে ব্রজের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত নিস্পন্দ থাকিত। এইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রেমের ভাব কৃষ্ণলীলার সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত। যে আপনা ভুলিয়া বিভুর প্রেমে এইরূপ আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছে—সেই পরম সাধু, সেই সে সারাৎসারের চরণপদ্ম লাভ করিয়াছে। ভগবানও সেই ভক্তের নিগড়ে অনুক্ষণ বাধা—তিনি তাহাকে অভয়ক্রোড়ে স্থান দেন, তাহাকে পিতামাতার মত ভক্তি করেন, তাহাকে ভাই-বন্ধুর মত ভালবাসেন, তাহার সহিত প্রণয়িনীর মত 'পীরিত' করেন। কৃষ্ণও তাই বাসুদেব হইয়াও নন্দদুলাল, দেবকীনন্দন হইয়াও যশোদানন্দ-বর্দ্ধন, রুক্মিণীরমণ হইয়াও রাধাবল্লভ, দ্বারকানাথ হইয়াও ব্রজেশ্বর।

ব্রজের লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের সকল অঙ্গ দেখাইয়াছেন। জগতে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র—এই সমস্তই অনুরাগের গ্রন্থি; একই অনুরাগ পাত্রভেদে কোথাও স্নেহ, কোথাও ভক্তি, কোথাও সৌহার্দ্দ, কোথাও প্রেম বলিয়া অভিহিত। পিতা পুত্রে, জননী সন্তানে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, সুহৃদে সুহৃদে, স্বামীতে স্ত্রীতে, একই প্রেম—একই অনুরাগ—ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত, কেবল পাত্রভেদে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত মাত্র। যেখানে অধিক মাত্রায় ঘণিষ্ঠতা, যাহার নিকট সঙ্কোচের অল্পতা, সেই স্থানেই অনুরাগের প্রবলতা, প্রেমের অবিচ্ছিন্নতা। তাই পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট সন্তানের 'আবদার' অধিক, তাই ভাই-বন্ধু অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অনুরাগ প্রবল। অদ্ভুত কৃষ্ণলীলায় এই মহান্ সত্য বিশদভাবে বর্ণিত—নন্দরাজ অপেক্ষা যশোমতীর বাৎসল্যে কৃষ্ণহৃদয় অধিক আকর্ষিত, শ্রীদাম-সুবল অপেক্ষা শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য তিনি অধিকতর লালায়িত।

প্রভাস-মিলনে আমরা ভক্তির প্রস্রবণ মাতৃবাৎসল্যেই অধিক পরিমাণে উৎসারিত দেখিতে পাই। যজ্ঞাগারস্থ তোরণসম্মুখে যশোদার ভক্তি-প্রস্রবণে কৃষ্ণচন্দ্রের "হাবুডুবু" ভাব দেখিয়া, বাস্তবিক, পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হয়। স্নেহের আবেগে যশোদা যখন "গোপাল,গোপাল" করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে হৃদয় খুলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ভক্তাধীন হরি আর তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না. তাঁহার বাহ্যক্রিয়া তখন শক্তিহীন, তাঁহার হস্তস্থিত জলপাত্র ভূমে নিপতিত হইল, তখন "মা, মা, কৈ মা, কেন মা, কোথা মা" বলিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ভক্ত এইরূপ প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে ভগবান স্থির থাকিতে পারেন না,—ধ্রুব প্রহ্লাদের ডাকের জোরেও ভগবান এইরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

কৃষ্ণ মা নন্দরাণীকে দেখিতে (না, দেখা দিতে ?) কাতর হইলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার রাজবেশ—তখনও তিনি মথুরার অধিপতি, ব্রজের গোপালবালক নহেন। তাই সাধকের অন্তরদর্শী ভক্তচূড়ামণি নারদ বলিলেন,—

"দয়াময় ! তোমার মা নন্দরাণী
তব এ রাজবেশ কভু দেখেনি,
এ বেশে তুমি গেলে পরে,
রাণী চিন্‌বে তোমায় কেমন ক'রে ?
নিরাশায় যা'বে ম'রে—
তাই নিবারি যাদুমণি।"

বাস্তবিক, ভক্ত তাহার ভগবানকে হৃদয়পটে যে মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়াছে, যেরূপে যে বেশে তাঁহাকে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহার রূপান্তর হইলে সে চিনিবে কিরূপে ? হিন্দু তাহার উপাস্য দেবতাকে, দুর্গারূপে, কালীরূপে, শিবরূপে, কৃষ্ণরূপে, বিষ্ণুরূপে, দেখিতে শিখিয়াছে—তাঁহাকে

ছানা-ননী খাওয়াইতে, জল-বিল্বদল দিয়া পূজা করিতে, অভ্যাস করিয়াছে—পুতুল (!) গড়িয়া তাহাতেই তাহার সাধাকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব কেন্দ্রীভূত করিয়াছে; তুমি জ্ঞানী তাহার নিরাকারত্ব সম্বন্ধে সহস্র শিক্ষা দিলেও, সে তাহা চিনিবে কিরূপে? সে চক্ষু মুদিলেই তাহার উপাস্য দেবতাকে 'বাজন হেলে, নেচে নেচে' আসিতে দেখে—সে রাজবেশ দেখিয়া ভুলিবে কেন?

নারদের কথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশ ছাড়িলেন, আবার সেই পীতধড়া পরিলেন, সেই মোহন চূড়া বাঁধিলেন, সেই অলক-তিলকে সাজিলেন, আর সেই বাঁকা ঠামে বাঁকা হইয়া ভক্তাভিমুখে চলিলেন। তার পর যখন দেবকী যশোদা উভয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃত্ব দখল করিতে কাতর, তখন ভক্তবৎসল হরি ভক্তেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, ত্রিভুবনের লোকসমক্ষে যশোদাকেই মা বলিয়া ডাকিলেন, আর 'একবার বাজে হেলে, নেচে নেচে' যশোদার ক্রোড়ে গিয়া মাখনলাল মাখন খাইলেন। এস, ভাই, আমরাও একবার হৃদয়-কপাট খুলিয়া সেই প্রেমভিখারী প্রেমের হরিকে প্রেমাসনে বসিতে ডাকি; প্রেমের গোরাচাঁদ প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া অবশ্যই আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিবেন, অবশ্যই আমাদিগের মানস-পূজার প্রেম-নৈবেদ্য খাইতে ছুটিয়া আসিবেন।

দেশমাতৃকায় ভক্তি।

[কমলাকান্ত।]

বহুকাল পরে কমলাকান্ত শর্ম্মা প্রসন্ন গোয়ালিনী সমভিব্যাহারে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে নব কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার সেই প্রাচীন কীটদষ্ট 'দপ্তর'টী একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। দেখি, কীটদষ্ট হইলেও, তাহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে, এখনও ভাবের রস উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সে রস আস্বাদনে ভাবুক মাত্রই এখনও তন্ময় হইয়া যান।

De Quincey-শিষ্য কমলাকান্ত "আফিম-প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইয়া" কোকিলের 'কুউ'-ধ্বনি, ভোমরার 'ভোঁ-ভোঁয়ানি', পতঙ্গের 'চোঁও-বোঁও,' বিড়ালের 'মেও-মেও,' প্রভৃতি অমানুষী ভাষা বুঝিতে পারেন, এবং মানুষের ভাষায় এরূপ ভাবে ব্যক্ত করেন যে তাহা 'মানুষ' মাত্রেরই মর্ম্মস্পর্শ করে। তিনি "আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে" কখন "সংসার-বৃক্ষে মায়াবৃন্তে" মানুষ-ফল ঝুলিয়া থাকিতে দেখেন, কখন সংসার-ঢেঁকিশালে নানা গুণের মনুষ্য-ঢেঁকির নানা সামগ্রী ভানিয়া বাহির করার পরিচয় দেন, কখন বা স-ভাষ্য "উদর-দর্শন" রূপ সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে কাহারও নিস্তার নাই—পুরুষ, রমণী, উকীল, হাকিম, দেশহিতৈষী, পরপ্রত্যাশী, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয় লেখকগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সমালোচনার অধীন। তাঁহার বিবেচনায়—

বিদ্যা—তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়; এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যা কখন সমর্থ হয় না।

বাঙ্গালীর বিদ্যা—স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই,—গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে, জানিলেই হইল।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারিকেলের মালার ন্যায় তাহা বড় কাজে লাগে না।

লিপিব্যবসায়ী—তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অন্যকে পড়িয়া শুনাইতে বড় ভালবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাহা বসিয়া শুনে, তাহার নিতান্তই বশীভূত হয়েন।

বঙ্গদেশের লেখকগণ—তেঁতুল-বিশেষ। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে অম্ল—তাও নিকৃষ্ট ; এক গুণ—নীরস কাষ্ঠাবতার—সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল! অমন কুসামগ্রী আর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশী হাকিমেরা—পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে তাহা দেশী নহে*—বিলাতী কুষ্মাণ্ড। [কিন্তু সুপক্ক, কি অকালপক্ক, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছু বলেন নাই।]

দেশহিতৈষীর দল—ঠিক যেন শিমুল ফুল। ফুল যখন ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা,—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না—একটু একটু পাতাঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত। ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই—কেবল বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা। ফলেও বড় লাভ ঘটে না ; অন্তর্লঘু ফল—রৌদ্রের তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে! তাঁহারা মনে করেন, ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে থাকেন।

বাহ্যসম্পদের পূজা—কয়ে তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরাজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত। Adam Smith পুরাণ এবং Mill তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এ উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল—বাঙ্গালা সংবাদপত্র কাঁসীদার। শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক।

আজকাল পলিটিক্‌সের খরস্রোতে পড়িয়া বাঙ্গালীর অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—Mendicant policyর নিন্দাবাদে দেশের মধ্যে বিলক্ষণ দলাদলি বাধিয়াছে;—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বহুদিন পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘোর Moderate—তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স—কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত * * * (উহা) হাস্যাস্পদ। (বাঙ্গালী জাতির) পলিটিক্‌স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!"—ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। * * * পলিটিক্‌স্ দুই রকমের—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। অস্মদ্দেশীয়গণের মধ্যে অনেকেই কুক্কুরের দলের পলিটিক্যাল।"

Socialism নামে আর একটা কথা আজ-কাল অস্মদ্দেশে শুনা যাইতেছে। মার্জ্জাররূপিণী Socialistএর সহিত তর্কপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অনেক দিন হইল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শুনাইয়া গিয়াছেন। বিড়ালী কমলাকান্তকে বলিতেছে—

"আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, * * * দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি—'খাইতে পাই না।' আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার

আছে। * * * আমাদের কৃষ্ণচর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ ধ্বনি শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? তোমার পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? * * * আমার মত দরিদ্রের দুঃখে কাতর কে হইবে? * * * তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজনের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর। চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?"—এই বিড়ালীর তর্কযুদ্ধে কমলাকান্ত শর্ম্মাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

উকীল-কুলের উপর কমলাকান্তের কিছু অতিরিক্ত উগ্র দৃষ্টি। শেষ দশায়—খোসনবীশ জুনিয়ারের আমলে—প্রসন্ন গোয়ালিনীর মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তিনি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে (পূর্ব্বপরিচিতা মার্জ্জারীর নিকটে কুশিক্ষা পাইয়াই বোধ হয়) তাঁহার একটু Socialistic ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। * * * সেকন্দর হইতে রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে right of theft কি একটা right নয়?"

এ সকল কথা শুনিয়া কমলাকান্তকে নিতান্ত ক্ষিপ্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন তাঁহার মুখে শুনি—"প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। * * * অনন্তকাল এই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক; মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না;"—যখন তিনি বলেন, "পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই;"—যখন তিনি আকুল-

প্রাণে প্রশ্ন করেন, "তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না?"—যখন তিনি উপদেশ দেন, "যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ। * * * যদি বিবাহবন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। * * * বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।"—তখন তাঁহাকে মানবজগতে একজন আদর্শপুরুষ বলিয়া বোধ হয়,—মহাগুরু জ্ঞানে তাঁহার উদ্দেশে বারবার নমস্কার করি।

তা'রপর কমলাকান্তের সেই একটীমাত্র সঙ্গীত-সমালোচনা। বাঙ্গালা ভাষার সেই মোহমন্ত্র শুনিয়া ভাবুক কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, এই গীত "কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।" আজ আমরাও (বোধ হয় সমস্ত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর সহিত এককণ্ঠে) বলিতে পারি, প্রসন্ন গোয়ালিনীকে তিনি সেই গীতের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়া গিয়াছেন তাহা কখন ভুলিতে পারিলাম না,—কখন ভুলিতে পারিব না। সেই বিশ্বব্যাপিনী মানবপ্রীতিই ঐ গীতের মূলসূত্র—"মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল। এক হৃদয় অন্যের হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল। সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্যজীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্যহৃদয়কামনা। (তাই) মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে—

"এসো এসো বঁধু এসো।"

"সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য" কমলাকান্ত ভাবিতেছেন, "আমি কেন দিবস গণিব?" পরক্ষণেই বলিতেছেন,

"গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। * * * যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি। * * * হায়? কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই,

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
বিধি মিলাইল, কই?"

যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? ঐক্য কই, বিদ্যা কই, গৌরব কই, শ্রীহর্ষ কই, ভট্টনারায়ণ কই, হলায়ুধ কই, লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?"

"সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মোক্তি।"—তাই বাঙ্গালী কমলাকান্ত নৈরাশ্যজনিত মর্ম্মবেদনায় আক্ষেপ করিতেছেন,—"আর বঙ্গভূমি! তুমি কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, * * * তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে—দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।"

"যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। (কিন্তু) যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শনও গিয়াছে,—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—সেই দুঃখী অনন্ত দুঃখী।" সেই অনন্ত দুঃখের আবেগে চিরদুঃখী কমলাকান্ত বলিতেছেন—"আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি—এসকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু

নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? * * * (সে) আর্য্যরাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই?—সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে,—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে? চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে,—নবদ্বীপ। * * * বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমি(র) প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর-তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণ কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য, কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাস-ঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি, তোমারই অতল গর্ভমধ্যে * * সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন,—বুঝি, কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। * * * যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

শেষ কথা—কমলাকান্তের "দুর্গোৎসব।" অহিফেন সেবনে বিকৃতমস্তিষ্ক কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন কুহক দেখিলেন,—তিনি দিগন্তব্যাপী কাল-স্রোতে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় একা ভাসমান—ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি?"

ভক্তবৎসল মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন—তাঁহাকে দেখা দিলেন, কমলাকান্ত চিনিলেন—"দিগ্‌ভূজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ"—"এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা"—"এই আমার জন্মভূমি"—"এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা !" তখন তিনি প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবার আকুল স্বরে ডাকিলেন—

> "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে !—শিবে !—সর্ব্বার্থসাধিকে !—
> অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে ! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখদায়িকে !"

"এসো মা, গৃহে এসো।" কিন্তু হায় ! মা আর শুনিলেন না—"সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল !"

তখন যুক্তকরে সজল নয়নে কমলাকান্ত আবার ডাকিতে লাগিলেন—"উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি ! উঠ মা ! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে ! এবার আপনা ভুলিব,—ভ্রাতৃবৎসল হইব,—পরের মঙ্গল সাধিব,—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি, ত্যাগ করিব— * * * উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি !"

"মা উঠিলেন না"—আবাহনের মুখেই বিসর্জ্জন ঘটিল—হায় ! আর "উঠিবেন না কি ?"

কমলাকান্তাকাঙ্ক্ষিত এই মাতৃচরণোদ্দেশেই সন্তানের দল গাহিয়াছে—"বন্দে মাতরম্ !" কমলাকান্ত ও সন্তানসম্প্রদায় যে এক মায়ের সন্তান—অতঃপর ইহার আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হয় না। "এস, ভাই,"—আমরাও ত সেই মায়ের সন্তান—এস, "ছয় কোটী" কণ্ঠে, "দ্বাদশ কোটী কর যোড় করিয়া" ভক্তিভরে সেই মাতৃচরণোদ্দেশে অভিবাদন করি—

"বন্দে মাতরম্।"

৪। রঙ্গসাহিত্য—

সীতার বনবাস।

[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।]

প্রতাপ-আদিত্য।

['রায় সাহেব' ও 'বিদ্যাবিনোদ' বিরচিত।]

সীতার বনবাস।

[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।]

সপ্তকাণ্ডময় রামায়ণ সমগ্র কাব্যজগতে কল্পতরু বিশেষ। ইহার শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই অমৃতবর্ষী। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের মধুরতা, ভক্তির তেজ, স্নেহের শৈত্য, প্রেমের উৎস, সৌভ্রাত্রের উৎকর্ষ—সকলই ইহাতে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। দয়া, মায়া, সাম্য, সৌম্য, ধৃতি, শান্তি, লীলা, খেলা, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য সোহাগ, অনুরাগ, শোকোচ্ছ্বাস, প্রেমোল্লাস,—ইহাতে নাই, এমন বস্তুই নাই। এমন পবিত্রতাময়, জটিলতাশূন্য, নবরসে * পরিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ জগতে দুর্লভ। সংসারের সকল চরিত্রের এরূপ সম্যক্ বিকাশ অল্প গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়—চরিত্রসংগঠনে ভাষাজগতে ইহা আদর্শস্থল। যত দিন ভাষার জীবনী শক্তি থাকিবে, ততদিন দেশে দেশে, যুগে যুগে, রামায়ণের অবিনশ্বরত্ব বিঘোষিত হইবে।

"সীতার বনবাস" এই সপ্তকাণ্ডময় কল্পবৃক্ষের একটী পল্লবমাত্রকে আশ্রয় করিয়া বিরচিত। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে সীতার বনবাসের তুল্য করুণরসাত্মক অংশ আর নাই। ভবভূতিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বাঙ্গালা গদ্যে প্রথম গ্রথিত করেন; পরে গিরিশ বাবু সেই আচার্য্যের পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার নামে উৎসর্গ

---

* অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা, মহাকাব্যের লক্ষণনির্ণয়ে, উহাকে একরসপ্রধান বলিলেও, রামায়ণ যে নবরসের প্রস্রবণ—তাহা উহার উপক্রমণিকাভাগেই ব্যক্ত দেখা যায়—

"রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভীরসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥"

বালকাণ্ড। ৪।৯।

করিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয়োপযোগী দৃশ্যকাব্যাকারে নূতন ছন্দে ঢালিয়া, তাহা বাহির করেন। বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ ছন্দ এই প্রথম। কবিবর রাজকৃষ্ণ তাঁহার 'নিভৃত নিবাসে'র স্থলবিশেষে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সূত্রপাত করেন সত্য, কিন্তু সমগ্র দৃশ্যকাব্যের ছন্দোবন্ধন ঐ সূত্রে গ্রথিত করার পক্ষে গিরিশ বাবুই, বোধ হয়, প্রথম প্রবর্ত্তক। ছন্দ ও অলঙ্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কবির অন্যতম কর্ত্তব্য ; সেই কর্ত্তব্যতার অনুরোধে কবিবর তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের মুখবন্ধে ঐ ছন্দের সৃষ্টি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন ও অনেক বিলাতী কবির কাব্যে ঐ ছন্দের প্রচলন সম্বন্ধে নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য অন্যবিধ ; রঙ্গালয়ের উৎকর্ষসাধন ও তাহার উপ-যোগিতানুপযোগিতা পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সুতরাং এই ছন্দ অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বুঝিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, একটা উদ্ভট উদ্ভাবনের জন্য কোনরূপ বাক্যব্যয় করেন নাই। এই ছন্দ, সাধারণ কাব্যামোদী পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ তৃপ্তিপ্রদ না হইলেও, অভিনয়ের পক্ষে বাস্তবিকই বিশেষ সুবিধাজনক। উহার মৃদু-মন্দ মন্থর গতি অভিনেতার অন্তরে সহজেই প্রবিষ্ট হয়, এবং আকুঞ্চন-প্রসারণময় কেমন একটু সুরলহরী শ্রোতার হৃদয়কে উল্লাসবায়ুভরে তরঙ্গায়িত করে। বাঙ্গালা কাব্যে এই ছন্দের প্রচলনকল্পে কবিবর ও নটরাজ উভয়ই সহৃদয় নাট্যামোদিবর্গের ধন্যবাদের পাত্র ; অধিকন্তু, রাজকৃষ্ণ বাবু উহার সম্যক্ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া সকলের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অতএব তিনি সমধিক ভক্তিভাজন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, রামায়ণে নাই এমন চিত্রই নাই। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে সীতার বনবাস অতি ক্ষুদ্রাংশ হইলেও, ইহাতে সেই সমস্ত চিত্রের অধিকাংশেরই ছায়া পড়িয়াছে। প্রজাপালন, অপত্যস্নেহ, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, স্বামীর সোহাগ, স্ত্রীর অনুরাগ, ভৃত্যের প্রভুপরায়ণতা,

ক্ষত্রিয়ের বিক্রম—সমস্তই ইহাতে জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত। গিরিশ বাবু সে গুলি কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রজাপালন।—অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন,—প্রজাবর্গের সুখ, স্বস্তি, ধন, মান, শিক্ষা, দীক্ষা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধানের উপায় নিরূপণ—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,—এই সমস্ত রাজার অনুক্ষণ চিন্তার বিষয়। সূর্য্যবংশাবতংস গুণধর রামচন্দ্র অতুলনীয় রাজনীতিবিশারদ, অকৃত্রিম প্রজাবৎসল, নরপতি ছিলেন;—প্রজাই তাঁহার জপ, প্রজাই তাঁহার তপ, প্রজার শুভান্বেষণই তাঁহার সার ব্রত। প্রজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য, প্রজার সন্দেহ দূর করিবার জন্য, তিনি প্রাণাধিক প্রিয় সহধর্ম্মিনীকে বনবাস দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিস্তৃত কোশলরাজ্যের চতুর্ভিতের প্রজাবর্গের অবস্থানিরূপণ ও রাজার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজার মতানুসন্ধানের ভার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই কর্ম্মচারীর মুখে "রাম-রাজ্য অসুখের নয়" শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না,—অসন্তোষসহকারে জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"এ সংবাদ হেতু নিয়োগ করি না তোমা',—
চাটুকারে পারে দিতে এহেন বারতা।
তব কার্য্য অন্যমত;—
কহ, দীনতা আছে কি রাজ্যে,
শস্যের অভাব, জলকষ্ট,
অকাল মরণ, কোন ঠাঁই?
দুর্জ্জনপীড়ন, শিষ্টের পালন,
হ'তেছে ত রাজ্যময়?"

নিজের কর্ত্তব্য-পরিচালন-দক্ষতায় তাঁহার সদাই সন্দেহ। যে বংশে দিলীপ, অজ, দশরথ প্রভৃতি নৃপতিগণ অসামান্য দক্ষতার সহিত

রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রাজত্বকালে তাহা কিছুমাত্র প্রতিহত—সে কুলগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন—হইতেছে কি না, ভাবিয়া তিনি অনুক্ষণ ব্যাকুল। প্রজাবর্গের কথাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহে কি সকলে
সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম ?"

'দুর্ম্মুখ' যোগ্য রাজার যোগ্য কর্ম্মচারী। প্রভুসমক্ষে মিথ্যা বলা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ; সে সর্ব্ববাদিসম্মত সুযশের কথা না গাহিয়া নির্ভয়ে কহিল—

"অবশ্য এ কথা কহে জনে জনে।"

রামচন্দ্রের মনে সন্দেহের আবিলতা মিশিল, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন. এবং লক্ষ্মণের স্বাভাবিক সৌভ্রাত্রসুলভ যশোগানে সুখী না হইয়া তাঁহাকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দুর্ম্মুখকে সত্য কহিবার জন্য সমধিক অভয় প্রদান করিলেন। দুর্ম্মুখ অগত্যা সাধ্বী সতী সীতার কলঙ্কাপবাদ প্রভুসমক্ষে জ্ঞাপন করিল। সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় থাকিলেও, প্রজার কথায় তাঁহার বিশ্বাস টলিল ; তিনি অকলঙ্ক রঘুকুলে কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া একেবারে বিকলচিত্ত হইলেন। এই কলঙ্ককালিমা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি জানকীকে কৌশলে বনবাসিনী করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখিলেন না। যে জানকীর জন্য তিনি কৈশোরে বনে বনে পরিভ্রমণ, কপটতা সহকারে বালিরাজকে নিধন পূর্ব্বক বন্যপশুর সহিত মৈত্রী সংস্থাপন. দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার, দুর্ব্বার দশাস্য-সংহার, প্রভৃতি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, লোকনিন্দার প্রবলতাড়নে সেই পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্ষোভ মিটিল না, লোকসমক্ষে সতীত্বের জ্বলন্ত সাক্ষ্য না দিয়া তাঁহার প্রজা-নিন্দাশঙ্কা মন হইতে উন্মূলিত হইল না। তাই দীনা, ক্ষীণা, মলিনা,

বল্কলপরিধানা জনকনন্দিনীকে বহুকাল পরে নিকটে পাইয়াও আলিঙ্গন-লাভে সুখী হইতে পারিলেন না,—উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংবরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সীতা যখন বহুকাল বিচ্ছেদের পর একবার প্রভুর "শ্রীমুখের বাণী" শুনিবার জন্য কাতরা, তখনও রামচন্দ্র আশা-ক্ষোভ-বিজড়িত স্বরে কহিলেন—

"প্রিয়ে! চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়া
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,—
হৃদি-বেগ কার সংবরণ;
ডরি, প্রাণেশ্বরি, মন্দভাষী জনে।
লঙ্কা-পুরে দেখিল অমর-নরে,
অগ্নির পরীক্ষা তব;
মন্দ লোকে সন্দ করে তায়,
কহে – ছায়াবাজী, পরীক্ষা সে নয়,
আজি পুনঃ অযোধ্যানগরে
দেহ সে প্রমাণ, সতি,—
কর, প্রাণেশ্বরি, রবিকুলমুখোজ্জ্বল।"

প্রজাপরতন্ত্রতার এরূপ সুন্দর চিত্র দেবলোকেও দুর্লভ। প্রজার সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য পতিব্রতা পত্নীর প্রতি এরূপ ব্যবহার সঙ্গত হইয়াছিল কিনা —ইহা মতভেদের বিষয়। কিন্তু প্রজার মনস্তুষ্টিসাধনকল্পে রাজার পক্ষে কত দূর ত্যাগস্বীকার সম্ভব—ইহা সাম্যবাদী পাশ্চাত্য নৃপতিকুলেরও শিক্ষার বিষয়। কেবল তরবারির জোরে রাজ্যশাসন হয় না,—প্রজার সহিত সহানুভূতি না থাকিলে, প্রজার মনস্তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিলে, রাজকার্য্যপরিচালনার দোষ-গুণ প্রজার মুখে না শুনিলে, রাজ্য সুশৃঙ্খল হয় না, রাজ্যে শান্তির সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখশূন্য, শান্তিশূন্য, রাজ্য শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণ।

সৌভ্রাত্র।—আজ-কাল "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই!"—ভাইয়ের

মর্য্যাদা ভাই বুঝে না, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সহানুভূতি অতীতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্যবাদী ধর্ম্মধ্বজী ভ্রাতারা জগতে অনন্ত অবিনশ্বর ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে অসাধারণ বাক্‌পটু, কিন্তু স্বগৃহে আপন সহোদরের ন্যায্য স্বত্ব হইতে তাঁহাকে কিরূপে বঞ্চিত করিবেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে ততোধিক কৌশলপর ও চেষ্টাশীল,—স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, ভক্তি-প্রীতি পরিহার করিয়া, আলাপ-আলিঙ্গন বিস্মৃত হইয়া, সহোদরের ছিদ্রান্বেষণে ও ধ্বংসসাধনে অনুক্ষণ তৎপর। পবিত্র রামলীলায় সে ভাব নাই, সর্ব্বজীবে সমভাব ও ভ্রাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এক সূত্রে গ্রথিত, একই আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকর্ষিত। রাম লক্ষ্মণ এক মা'র সন্তান নহেন, তথাপি কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের চরণে "চির অনুগত দাস", সুখে দুঃখে—সম্পদে বিপদে—চিরদিন ছায়ার ন্যায় অনুগামী; জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, চিরদিন একপ্রাণ। আমরা লক্ষ্মণের মুখে শুনিতে পাই—

"প্রভু! আজন্ম সেবিনু শ্রীচরণ,
শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান, শ্রীচরণ হেরি'
বনবাসে পাশরিনু রাজ্যসুখ,
শ্রীচরণ-আশে কুটীরনিবাসে
লইনু নশ্বর শর করে
বিনাশিতে বিরামদায়িনী নিদ্রা,
*　　*　　*　　(যবে)
ভাবিলাম অন্তিম আমার,
প'ড়েছিল মনে শ্রীচরণ—"

বস্তুতঃ শ্রীরামের শ্রীচরণ ধ্যান ভিন্ন লক্ষ্মণের অন্য কোন ব্রত ছিল না। রামচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; কি রাজসভায়, কি অন্তঃপুর-বাটিকায়, কি রণাঙ্গনে, কি বিহার-বনে, তিনি কখন লক্ষ্মণ ছাড়া হইতেন না, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করিতেন না। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুমতি পালনে কখন দ্বিধাচিত্ত হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই;

তাই যখন মাতৃস্বরূপিণী জনকনন্দিনীকে কৌশলে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-বাসিনী করিতে, সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জন দিতে, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরামের মনে যুগপৎ ক্ষোভ ও অভিমানের উদয় হইল, তিনি বলিলেন—

"বুঝিনু বুঝিনু, ভাই, তুমিও, লক্ষ্মণ,
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়'
সেই হেতু না শুন বচন।"

অন্য ভ্রাতার পক্ষে অবাধ্যতার জন্য অনুরূপ তিরস্কারের, অন্যবিধ শাসনের, প্রয়োজন হইত ; কিন্তু লক্ষ্মণের অন্তরে ইহাতেই শেল বিদ্ধ হইল, ঘৃণা-লজ্জার সহস্র বৃশ্চিক তাঁহার মর্ম্মের পরতে পরতে দংশন করিতে লাগিল, তিনি যন্ত্রণায় কাতরপ্রাণ, বিকলচিত্ত, হইয়া বলিলেন—

"দ্বিধা হও, জননি মেদিনি!
বজ্রাঘাত হ'ক শিরে,
রে নয়ন! ক'র না রে বারি বরিষণ,
উপাড়ি' পাড়িব বাণে ;—
পালিব হে আজ্ঞা তব,
বজ্র পাতি' ল'ব বুকে তোমার বচনে,
জ্যেষ্ঠ তুমি পিতৃসম মম।"

ধন্য লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপরায়ণতা! পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুজ্ঞাপালনের নিমিত্ত তিনি বক্ষোপরি বজ্রক্ষেপ সহ্য করিতেও অকুণ্ঠিতচিত্ত। কবিবর রাজকৃষ্ণ প্রকৃত সহৃদয়ের ন্যায় বলিয়াছেন—

"সরযূ গো, কুল-কুল-রবে
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি—ভ্রাতৃস্নেহ—কথা
বহি' তুমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,
শুনাইয়া যাও যত ভ্রাতৃজনগণে।"

আমরাও তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি,

যেন রামলক্ষ্মণের এই ভ্রাতৃভক্তির, এই ভ্রাতৃস্নেহের, কথা বায়ুভরে দিগ্-দিগন্তে, দেশ-বিদেশে, ধ্বনিত হয়, আর ভ্রাতৃদ্বেষী নরকুঠারগণ তাহা হৃদগত করিয়া স্বীয় চরিত্রসংশোধনে ও সংসারের শান্তিসংরক্ষণে যত্নবান হয়।

মাতৃভক্তি।—এই মায়াময় সংসারে মা ছাড়া আর সর্ব্বার্থসার সামগ্রী নাই; সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সমভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে, সংসারে মা'র মত আর কেহ নাই। নৈসর্গিক নিয়মবলে যখন ইহ-সংসার দেখিবার জন্য জরায়ুমধ্যে স্থান লইলাম, তখন হইতেই মা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, মা'র আহারবিহারের অবস্থাভেদে আমার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; যখন সেই মায়া-মোহের অতীত, অখিল সুখের আধার, মাতৃগর্ভ হইতে ভূতলে পড়িলাম, মায়াপাশে মোহবশে জড়াইয়া গেলাম, তখনও সেই মাতৃক্রোড়ে,—মা-ই সেই মূর্ত্তিমতী মায়া। বয়সের প্রস্ফুটনে যখন বাক্-শক্তির প্রথম প্রস্ফুটন হইল, তখনও সেই অস্ফুট আধ-আধ 'মা' শব্দ মুখে;—ইহজীবনের গতি পর্য্যালোচনে মা-ই চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। আবার যখন মুমূর্ষু অবস্থা, দারুণ আধিব্যাধিতে সর্ব্ব শরীর নিপীড়িত, সংসারের আশা ভরসা চিরদিনের জন্য গমনোন্মুখ, তখনও একবার ভ্রান্ত মনে, উদাস প্রাণে, কাতরস্বরে, বিশ্বজনীন 'মা!—'শব্দ মুখে ডাকিয়া সেই যন্ত্রণার ক্ষণিক অবসান হয়। পুত্র, কলত্র, ভাই, বন্ধু, অধিক কি জন্মদাতা পিতাকেও, বিস্মৃত হইতে পারি, ঈশ্বরের নাম মুখে না আনিতে পারি, কিন্তু অনন্তপ্রেমপরিপূর্ণ, আনন্দোচ্ছ্বাসের মূল নিদান, 'মা' শব্দ ভুলিতে পারি না। ইহসংসারে আসিয়া যে মাতৃস্নেহসুখ ভোগ করিতে না পারিল, মা'র অমৃতময় স্নেহপ্রস্রবণের সুশীতলতা অনুভব করিতে না পারিল, একবার প্রাণ ভরিয়া মা-মাখা মাতৃভাষার 'মা' বলিয়া ডাকিতে না পারিল, তাহার জন্মধারণই বৃথা, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র,—গৃহ তাহার পক্ষে ভীষণ অরণ্য সমান! আর যে সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মা'র মনস্তুষ্টিসাধনে প্রাণপণে যত্ন না করিল, অপরিশোধ্য মাতৃঋণের

জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত থাকিল, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য,—সংসারকাননে নররূপী দুর্দান্ত পিশাচ। হিন্দুর-গৃহে মা উপাস্য দেবতা; মা'র বিমলানন্দদায়ী দেবভাবে মত্ত হইয়া, মা'র পবিত্র পাদোদক পান করিয়া, সে ইহসংসারে স্বর্গ সুখে সুখী, তাহার সহস্র পাপ তাহাতে বিনষ্ট।

পবিত্র রামচরিতে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেদীপ্যমান। "জননী * * * স্বর্গাদপি গরীয়সী" শিক্ষা দিয়া রঘুকুলকেশরী রামচন্দ্র বিষ্ণুর অংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র; কোমলমতি লব-কুশও মাতৃপরায়ণের একশেষ। মাতৃনামগানে, মাতৃচরণধ্যানে, তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়; আমার লবের মুখে শুনিয়াছি—

"মাগো! যবে খেলি বনস্থলে,
ক্ষুধায় আকুল হইলে, মা' দুইজনে,
ভাবি নয়ন মুদিয়ে পা দু'খানি তো'র,
যায় ক্ষুধা দূরে,
প্রাণ ভরে ডাকি মা মা ব'লে,—
খেলি পুনঃ হইয়ে সবল।"

যখন রামচন্দ্র লব-শরে বিপর্য্যস্ত হইয়া, বিক্রমের শেষ পরিচয়, হংসাকার পাশুপত বাণ লবের উপর নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত, তখনও শিশুর অন্য কোন সহায় নাই, কেবল একমাত্র সম্বল—

"অক্ষয় কবচ বুকে মা'র নাম ধ্যান।"

আবার যখন সেই শরের গতি-রোধ-শক্তি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া লব নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ, তখন কুশ সময় বুঝিয়া ভ্রাতার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিল—

"কেন, দাদা, হ'তেছ চঞ্চল?
আমাদের মা'র নাম বল,—
যুড়ি বাণ মা'র নাম স্মরি'।"

বাস্তবিক, অটুট বিশ্বাসে, অচলা ভক্তিতে, সেই মহামন্ত্র জপ করিয়া লব যে ব্রহ্মজাল বিস্তার করিল, দুর্ব্বার দশাস্যবিজয়ী রামচন্দ্রও আর তাহা এড়াইতে পারিলেন না। প্রগাঢ় মাতৃভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য সভ্যজাতি এই পবিত্র মাতৃমর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না,—স্বয়ং কার্য্যক্ষম হইলে, বন্য পশুপক্ষীর ন্যায়, আর মাতৃ-সাহচর্য্য গ্রহণ করেন না,—'পিতার পরিবার' জ্ঞানে তাঁহার গৃহসীমা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। আমাদিগের সমাজের অনুকরণপ্রিয় অনেক মহাত্মারাও আজকাল ঐ ভাব ধারণ করিতেছেন;—বাহিরে স্বদেশানুরাগের ধ্বজা তুলিয়া দিগন্তব্যাপী বক্তৃতার রোল তুলিতেছেন, সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু গৃহে পলিত-কেশা, গলিত-বেশা, বৃদ্ধা জননী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িতা,—তাঁহার দিকে লক্ষ্য নাই। এই সকল কীর্ত্তি-ধ্বজীরা তাপসশিষ্য শিশু লব-কুশের নিকট মাতৃমর্য্যাদা শিক্ষা করুন,—ভাগ্যহীনা ভারতমাতার বিক্ষত বক্ষে এক বিন্দু তৈলসিঞ্চন করুন।

দাম্পত্যপ্রেম।—রমণীই সংসারবন্ধনের গ্রন্থি—সংসারসুখের একমাত্র আকর্ষণী শক্তি। পুরুষ-প্রকৃতির অটুট মিলনেই বিশ্বসংসার পরিচালিত;—একের অভাবে অন্যের অবস্থান অসম্ভব। শ্রদ্ধার ভীতি, ভক্তির প্রীতি, প্রেমের বিলাসিতা, সেবার একাগ্রতা—একাধারে সাম্য-বৈষম্যের এমন মোহন মিলন আর কোথাও নাই। পবিত্র হিন্দুসংসারে এই দেবভাব বিদ্যমান। শাস্ত্রের শাসনে, সমাজের বন্ধনে, পিতার শিক্ষায়, গুরুর দীক্ষায়, কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে, কর্ত্তব্যতার প্রবল জ্ঞানে, হিন্দুরমণী চিরদিন স্বামীর আশ্রিতা, স্বামিসেবাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত, তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সাম্যপ্রিয় প্রেমিকের নিকট এই আশ্রয়-আশ্রিত ভাব, এই অনাবিল নিঃস্বার্থতা, দুর্লভ। প্রেমের বিনিময়ে সুখ নাই, সৌন্দর্য্য নাই, পবিত্রতা নাই—সে কেবল ব্যবসায় চাতুরী মাত্র। "ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসি

না ; আমার এই প্রকৃতি,—তোমা বই আর জানি না।"—এই স্বার্থশূন্য, একাগ্রতাপূর্ণ, ভালবাসাই প্রেমের উৎকর্ষ। জনকনন্দিনী, শ্রীরামরমণী, সীতা এই নিঃস্বার্থ অনুরাগময়, পতিভক্তিপরায়ণ, স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ। সুখে দুঃখে স্বামীর প্রতি সমান অনুরাগ, সমান ভক্তি, সীতা ব্যতীত অন্য নারী-চরিত্রে দুর্লভ। বিনা অপরাধে, পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায়. বনবাস দেওয়ার পরেও, শ্রীরামের নির্ম্মম ব্যবহারের নিমিত্ত সীতা কিছু মাত্র দ্বিধাচিত্ত, কর্ত্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র বিচলিত, নহেন ;—স্বামীর প্রতি তখনও অটল ভক্তি, কেবল নিজ মন্দ ভাগ্যের জন্য আপনার উপরেই ঘৃণা। যখন আদর্শদেবর লক্ষ্মণ তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রঘুনাথপদে সীতার শেষ নিবেদন—

"যেন জন্ম জন্মান্তরে
হয় মম রাম সম স্বামী,
সীতা নারী না হয় তাঁহার।"

স্বামীর গুণগান শ্রবণে সতীর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। রাজ্যভোগ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামীসহবাসসুখে বঞ্চিতা হইয়া, পতিপ্রাণা জনকনন্দিনীর কোন বিকার নাই ;—বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশের শিশুমুখে রাম-কাহিনীর শ্রুতিবিমোহন গান শুনিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান। সদাই মুখে—

"গাও দু'টী ভাই মিলে রাম-গুণ-গান।"

একদা রামগুণ গান করিতে করিতে, সীতার বর্জ্জনপ্রসঙ্গে, কুশ রামের নির্দ্দয়তার জন্য তাঁহার সহৃদয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান, তখন মূর্ত্তিমতী সতী সন্তানকে বুঝাইলেন—

"ওরে দুঃখিনীসন্তান!
রাম কভু নহে ত পাষাণ,—
দয়াময় ভুবনপাবন তিনি ;
অভাগিনী জনকনন্দিনী সীতা।"

বহুকাল পরে রামানুচর হনুমানের মূর্ত্তিদর্শনে পতিপ্রাণার অন্তরে রামের স্মৃতি প্রবল হইল। লব-কুশের মুখে সমরবিজয়ের কথা শ্রবণে, এবং লবকরে শ্রীরামের অঙ্গভূষণ ও কুশহস্তে হনুমানের বন্ধন দর্শনে, সীতার অন্তরে অকস্মাৎ রামবিয়োগাতঙ্ক উদিত হইল, সীতা অমনি মোহিতা। সীতার অন্তরদর্শী হনুমান সেই মোহাপনোদনের মহা মন্ত্রৌষধি জানিত, সে বলিল,—

"রাম-নাম কহ দোঁহে জানকীর কাণে,
নহে প্রাণ ত্যজিবে জানকী।"

বহুদিন অদর্শনের পর, বনবাসের কঠোর যন্ত্রণাভোগের পর, স্বামীর চরণ দর্শনে সতীর হৃদয় আশাভরে উৎফুল্ল। কিন্তু মন্দভাগিনী তখনও স্বামীর আলিঙ্গনসুখলাভে সুখী হইতে পারিলেন না,—তখনও তাঁহার মুখে অগ্নিপরীক্ষার আজ্ঞা। পতিব্রতা বৈদেহী তাহাতেও বিকলচিত্ত নহেন;—দুঃখিনীর ধন দুটীকে "দয়ার নিদান রবি-কুল-রবি-করে" অর্পণ করিয়া পরমানন্দে পতির সমক্ষে মানবলীলা সম্বরণ করিতে প্রস্তুত। তখনও স্বামীপদে অন্তিম প্রার্থনা—

"হে প্রভু! জন্ম জন্মান্তরে
যেন পাই তোমা সম স্বামী।—
যেন সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে।"

স্বামীর সোহাগে যা'র নিরহঙ্কার, স্বামীর বিরাগে যে নির্ব্বিকার, স্বামীর নাম শ্রবণে যা'র সুখোদয়, স্বামীর অভাবে যা'র জীবনক্ষয়, সেই মূর্ত্তিমতী সতী—নারীরূপা ভগবতী। পতিভক্তির একাগ্রতায় সতীর ইচ্ছাশক্তি অজেয়—অব্যর্থ। যখন দুঃখিনী জনকনন্দিনীর অঞ্চলের নিধিদুটী বাল্য-খেলাছলে বনে বনে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগের অন্য কোন রক্ষক নাই—দুঃখিনীর অমোঘ আশীর্ব্বাদই তাহাদিগের একমাত্র রক্ষা-কবচ। সীতা ধ্রুব বিশ্বাসে বলিলেন—

"—যদি কেহ হয় বাদী,
প্রহারে দুঃখিনী-সুতে,

ফিরিবে না দেশে আর;
পরাজয় হ'বেন শ্রীরাম,
যদি তিনি বাদী হ'ন রণে। সতী আমি,—
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়মনে,
পতিপদে থাকে মতি,
মিথ্যা কভু না হবে বচন।"

বাস্তবিক, সতীর বচন মিথ্যা হইল না,—সীতার অন্তরের একাগ্রতাবলে শ্রীরামচন্দ্রও শিশুহস্তে পরাভূত হইলেন।

অভিমান প্রেমের অঙ্গ,—অনুরাগের পরিমাণদণ্ড। যে প্রেমে অভিমান নাই, সে প্রেমানুরাগ অগাধ অতলস্পর্শী নহে। জলতলে মৃৎপিণ্ড বিক্ষেপ করিলে তাহার গভীরত্ব নির্ণীত হয়;—প্রেমের প্রস্রবণে অভিমানের বাধা ঠেকিলে তাহার প্রবলতা বুঝা যায়। পতিব্রতা জানকীর প্রেমেও আমরা সুবিমল অনুরাগজনিত অভিমানের ছায়া দেখিয়াছি। বনবিহারিণী জানকী-সঙ্গিনী সরলতাময়ী অলিক্ষরা যখন, দুঃখকথাপ্রসঙ্গে, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার সংবাদ সীতা সমীপে জ্ঞাপন করিল, এবং তদুপলক্ষে সীতাকে লইতে অনুচর না আসার জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, তখন অভিমানিনীর অন্তরাকাশ অভিমানমেঘে আচ্ছন্ন হইল, তিনি সাগ্রহ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একা যজ্ঞ করিবেন রাম?—
কিম্বা কোন ভাগ্যবতী সতী
পাইয়াছে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম পতি?"

অলিক্ষরার মুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া সেই মেঘ আরও ঘনত্ব ধারণ করিল, সীতা সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত পুনরপি কহিলেন—

"কহ, বিধুমুখি,
কোন্ ভাগ্যবতী হ'য়েছে রামের পাশে?"

তখন অলিক্ষরার মুখে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাগঠিতা স্বর্ণ-সীতার বার্ত্তা শ্রবণে

সে মেঘ কাটিল, প্রাবৃটন্তে শারদ কৌমুদীর সুবিমল রশ্মি দেখা দিল। অভিমানিনী বুঝিলেন, তাঁহার নিশ্চল, নিস্পন্দ, প্রশান্ত প্রেমপ্রবাহে শ্রীরামচন্দ্রই প্রকৃত কর্ণধার। তিনি উল্লাসভরে কহিলেন—

"জন্ম জন্মান্তরে শ্রীরামচরণে
যেন চিত্ত রহে অচলিত।"

তিনি বুঝিলেন, রামচন্দ্রের প্রেমানুরাগের ইয়ত্তা নাই; রামবিহনে তিনি যাদৃশী কাতরা, সীতাবিহনে রামচন্দ্রও ততোধিক ব্যাকুল। তিনি সখীকে কহিলেন—

"সখি, কাঁদি নাই আমা হেতু—
দয়াময় রাম,
না জানি, কাঁদেন কত দাসীর বিহনে!"

বলিতে বলিতে রামের অলৌকিক অনুরাগের পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার মনে প্রবল হইল, তিনি একে একে সব কথা সখীকে শুনাইলেন, দর-দর ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন এহেন করুণাসাগর রাম কোথা, আর কোথা তাঁর সীতা—এই চিন্তাই তাঁহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। রামসীতার এই পবিত্র প্রণয়কাহিনী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রব হয়, ঘোর অপ্রেমিকের অন্তরেও অনুরাগসঞ্চার হয়, পাপাচারিণী বারবনিতার মনেও পবিত্রতার উদয় হয়।

ক্ষত্রিয়বিক্রম।----ক্ষত্রিয়ের তেজ, ক্ষত্রিয়ের সাহস, ক্ষত্রিয়ের বিক্রম ভুবনবিখ্যাত। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, ক্ষত্রিয়শোণিত প্রবহমান। শৈশবের ক্রীড়ায়, যৌবনের জীবলীলায়, বৃদ্ধের ভগ্নদশায়, কামিনীর কমনীয়তায়, ক্ষত্রিয়ের অদম্য উৎসাহ, অতুলনীয় সাহস, সমভাবে বিরাজমান। বৈদেশিক ঐতিহাসিকের লেখনীতে একথা যতই বিকৃত হউক,—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, রাজপুতের বীরত্ব, প্রতাপচন্দ্রের অসমসাহসিকত্ব, জগতে চিরদিন অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিখ্যাত সূর্য্যবংশ এই ক্ষত্রিয়বংশের আদি, লোকাভিরাম

রামচন্দ্র সেইবংশের অবতংস। তাঁহার অসাধারণ তেজোবিক্রমের পরিচয় লঙ্কাসমরেতিহাসের পত্রে পত্রে বর্ণিত। রণক্ষেত্র তাঁহার ক্রীড়াভূমি, রণোপকরণ তাঁহার বিলাসসামগ্রী, রণকৌশল তাঁহার অবকাশরঞ্জক, রণাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যনিবারক।

সীতার বনবাসের পর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ইহার অন্যতম নিদর্শন। "ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া বীর-পুত্র যেই" বলিয়া ঘোড়া ছাড়া, তাঁহার প্রবল পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী অনুসন্ধান করা, তাঁহার সীতানির্ব্বাসনজনিত ছন্নমতি সুস্থির করিবার অন্যতম উপকরণ। বাস্তবিক, বীরপুত্রহস্তেই তাঁহার ঘোড়া ধরা পড়িয়াছিল, তাহার সমুচিত ফলও ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণদান ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম—স্পর্দ্ধার বিষয়। শিশুর সমরে বীরভ্রাতা নিধন হইল, বীর সৈন্য প্রাণ দিল, নিজেরও 'শরভঙ্গ-দত্ত তূণ শূন্যপ্রায়, পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ', প্রাণরক্ষারও অল্প ভরসা, তথাপি রামচন্দ্রের মুখে—

> "পৃষ্ঠ কভু না দিব সমরে,
> না পারিব কুলে দিতে কালি।

বীরপুত্র লবের মুখেও সেই একই কথা। লব যখন রামের ব্রহ্মজালে বদ্ধ এবং সেই জাল হইতে মুক্ত হওয়ার পক্ষে সন্দিগ্ধ, তখন লব প্রবল নৈরাশ্যের সহিত কুশকে বলিল—

> "ব'ল জননীরে, পৃষ্ঠ নাহি দি'ছি রণে,
> পড়িয়াছি সম্মুখ সমরে।"

লব-কুশের শিক্ষাভার উপযুক্ত গুরুর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি অদ্ভুত সংসারতত্ত্বজ্ঞ,—ক্ষত্রিয় পুত্রের পক্ষে সমর-কৌশল শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সে কারণ অন্যবিধ শিক্ষার সঙ্গে তিনি লবকুশকে যুদ্ধনীতিও শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার ফল এই অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরা পর্ব্বে দেদীপ্যমান। লব-কুশ যে কালক্রমে

অসাধারণ যুদ্ধবিশারদ হইবে, সসৈন্য রামচন্দ্রকেও পরাভব করতে পারিবে, তাহা আমরা তাহাদিগের শৈশবসংগীতেই বুঝিয়াছিলাম। উল্লাসভরে 'মিঞা-মল্লারে' যখন তাহাদিগের শিশু মুখে শিশুগান শুনি—

> "ধরি' ধনু করে শরে শরে,
> চল—বাঁধিগে সরযূধারাগুলি।
> চল—গগনে পবনে রোধ করি;
> শত শত কত বাঁধি করী;
> চল—গিরি তুলি' মাথি রণধূলি।"—

তখন এই দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণেও ক্ষণেক নির্ভীকতার কিরণ পড়ে, সাহসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কি এক অব্যক্ত তেজে হৃদয় মাতুয়ারা হইয়া উঠে।

'সীতার বনবাসে'র অন্যান্য চরিত্রবিন্যাসেও গিরিশ বাবু বিফল হয়েন নাই;—সরযূতীরে শত্রুঘ্নসমীপে দুই জন দূতের প্রাকৃতিক পার্থক্য, যজ্ঞস্থলে সভাসদ্‌বেষ্টিত শ্রীরামসমক্ষে লব-কুশের বালকত্বের ক্রমবৈষম্য,* ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার গানগুলিও সুমিষ্ট; বিশেষতঃ, বিলাসকাননে সঙ্গিনী-গণের সহিত রসালাপে, সরযূতীরে স্বভাবসৌন্দর্য্যের আকর্ষণে, ঘোর

---

* গিরিশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে, সম্ভবতঃ লোকপরম্পরাগত প্রবাদমতে, কুশকে কনিষ্ঠ ও লবকে জ্যেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূল রামায়ণে কিন্তু তদ্বিপরীত অবস্থা দৃষ্ট হয়—

> "যস্তয়োঃ পূর্ব্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসৎকৃতৈঃ।
> নির্ম্মার্জ্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥
> যশ্চাবরো ভবেত্তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।
> নির্ম্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ সনামতঃ॥
> এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।
> মৎকৃতাভ্যাং চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ॥"
>
> —উত্তরকাণ্ড। ৭১।৭,৮,৯।

ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী নিশায় জনশূন্য অরণ্যে ক্ষোভ-ভয়-নৈরাশ্যের প্রবল উচ্ছ্বাসে, নির্জ্জন তপোবনে পূর্ব্বস্মৃতির কুহকে ও বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তায়, সীতার হৃদয়নিঃসৃত সঙ্গীতাবলী বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি, যেন প্রত্যেক রঙ্গালয়ে এই করুণরসাত্মক দৃশ্যকাব্যখানি অভিনীত হয়।

প্রতাপ-আদিত্য।

['রায় সাহেব' ও 'বিদ্যাবিনোদ' বিরচিত।]

শুভক্ষণে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম রায়ের স্বদেশপ্রাণতার কাহিনী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই গুণে এত দিনে নির্জীব বাঙ্গালীপ্রাণে বীরসম্মানস্পৃহা জাগরিত হইয়াছে,—তাহার ফলে, কালে অকালে, সহরে ও মফঃস্বলে, পুরুষ ও মহিলা মহলে, নানা স্থলে আমরা বীরপূজার আয়োজন দেখিতেছি। এই পূজার আয়োজন বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে, তাই 'মজা'র আসরে 'বঙ্গের শেষবীর' দেখা দিয়াছেন,—'আলিবাবা'র কবি বঙ্গের "প্রতাপ-আদিত্য' অাঁকিয়াছেন। আর কিছু না হউক, 'বঙ্গের শেষবীর প্রতাপ-আদিত্য' রঙ্গসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া রাজধানীর রঙ্গপ্রিয় দর্শকমণ্ডলীর রুচির স্রোত কতক পরিমাণে ফিরাইতে পারিয়াছেন, ইহাও এই হতভাগ্য দেশের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ 'রায় সাহেব' ও 'বিদ্যাবিনোদ' মহাশয়-কৃত এই দুই গ্রন্থে প্রতাপচরিত্রের কিরূপ আভাস পাওয়া যায়, এস্থলে সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'বিদ্যাবিনোদ' মহাশয়-কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু উহার সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থ সম্বন্ধে তদতিরিক্ত বলিবার বড় কিছু নাই; আর 'রায় সাহেব' কৃত গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই তদীয় কৃতিত্বের সম্যক্ পরিচয়। ফলতঃ গ্রন্থের সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে,—অঙ্কিত প্রতাপচরিত্র কিরূপ সদ্‌গুণের আদর্শ, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য। উভয় গ্রন্থের ভূমিকাতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, "(উপন্যাস বা) কাব্য ইতিহাস নহে ;" আমরা সে ইঙ্গিত বিস্মৃত হই নাই—প্রত্যুত, ঐতিহাসিক প্রতাপচরিত্র অনুসরণ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপন্যাস ও কাব্যগত প্রতাপচরিত্রের আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সত্যের উপর ভিত্তি সংস্থাপিত বলিয়া এই উভয় গ্রন্থের মৌলিক বিবরণে বা ঘটনা-পারম্পর্য্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, তবে ইহার অবান্তর চরিত্রকল্পনায় অবশ্যই স্ব স্ব কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। এইরূপ কল্পিত চরিত্রের মধ্যে উপন্যাসোক্ত ফুলজানি ও নাটকোক্ত কল্যাণী সহজেই পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। বাস্তবিক, সূর্য্যকান্তের প্রণয়াভিলাষিণী ফুলজানির ও শঙ্করগৃহিণী কল্যাণীর প্রেমভক্তিবিমিশ্র স্বদেশানুরাগ ও বীরমহিলাসুলভ স্বাবলম্বন দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি,—এই চিরবিষণ্ণ বাঙ্গালী-প্রাণও ক্ষণেকের জন্য কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; এই দুই চরিত্রের আভায় অন্য সমস্ত চরিত্র যেন নিষ্প্রভ বোধ হয়। নাটকে আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—'যশোরেশ্বরীর সেবিকা' যশোহরের সাক্ষাৎ বিজয়লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী বিজয়া। প্রতাপের নবজীবনসংগঠনে বিজয়াই অন্যতম নিয়ন্ত্রী—তাঁহার সাধুসঙ্কল্পসাধনের একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। একদিন দেবী রাণীর মুখে শ্রীভগবানোক্ত—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শুনিয়া আশার সঞ্চার হইয়াছিল; আজি পুনঃ বিজয়ার মুখে অভয়ার অভয়বাণী—

> "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

শ্রবণে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সমস্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ আমাদিগের প্রতিপাদ্য নহে।

প্রতিভাশালী পুরুষের প্রতিভার উন্মেষ অপরিণত বয়স হইতেই প্রতীয়মান হয়। বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্তরে স্তরে সে প্রতিভা প্রস্ফুট হইয়া উঠে, তখন তাহা সান্ত হইতে অনন্তে উধাও হয়—পারিবারিক সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে সুদূর পরিধিব্যাপী বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। নাট্যচিত্রে

বীরেন্দ্র প্রতাপের প্রতিভার লক্ষণ আমরা 'শোণিতপিপাসু' শ্যেনের 'সংহার' উপলক্ষে প্রথম প্রত্যক্ষ করি। এই সূত্রেই প্রতিভার অন্যতম অবতার ব্রাহ্মণতনয় শঙ্কর প্রতাপের 'ভৃত্য,'—'বঙ্গের শেষবীর' প্রতাপ শঙ্করের চির 'দাসানুদাস।' সমধর্ম্মী প্রতাপ ও শঙ্করের এই শুভ সম্মিলন নিতান্ত মধুর হইলেও, উপন্যাসে এই ঘটনার আরও পূর্ব্বে আমরা ইঁহা-দিগকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাই। সেখানে "স্বভাব-সুন্দর সুন্দর-বনের নিবিড় অরণ্যে" উভয়ে মৃগয়ানিরত—পরস্পর স্ব স্ব বিক্রম প্রদর্শনে উৎফুল্ল—আর সঙ্গে তাঁহাদিগের অন্যতম সহচর শ্রীমান্ সূর্য্যকান্ত গুহ। নাটকে এই সূর্য্যকান্ত 'শঙ্করের শিষ্য'মাত্র,—উপন্যাসে ইনি প্রতাপ ও শঙ্করের সখা—প্রতাপের 'জীবন যজ্ঞে' প্রাণাহুতি প্রদানে অন্যতম প্রবর্ত্তক। এই মৃগয়াক্ষেত্রেই প্রতাপের 'উচ্চ সঙ্কল্পের' আভাস পাওয়া যায়;—তিনি 'জলশূন্য নদী'বৎ 'রাজ্যশূন্য' 'ভূয়া রাজসম্মানে' বিতৃষ্ণ;— "এই যে বনে বনে ভ্রমণ,—এই যে মরণভয় তুচ্ছ করিয়া ঘোর হিংস্রজন্তু-গণ শিকার করিয়া মনে মনে আনন্দলাভ, ইহা (তাঁহার ভাবী) মহাযজ্ঞের পূর্ব্বানুষ্ঠান।" এই ক্ষেত্রে আমরা প্রতাপচরিত্রের আর একটু পূর্ব্বাভাস পাই,—সেটী তাঁহার পর-'চিত্তের প্রতি সন্দিহান' ভাব; এস্থলে তিনি 'আত্মহৃদয় দিয়া' শঙ্কর-'চিত্তের প্রতি লঘুতা প্রতিপন্ন করিতে' গিয়াছিলেন, অন্যত্র আমরা তাঁহার অন্য চিত্তের প্রতি সন্দেহের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

নাটকীয় প্রতাপ বজ্রনির্ঘোষে পিতৃসমক্ষে বলিতেছেন—"অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যা'কে রাজদণ্ড হাতে কর্'তে হ'বে, পররাজ্যলোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা ক'রতে কথায় কথায় যা'কে অস্ত্র ধ'রতে হ'বে, অহিংসাময় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তা'র নয়। শক্তি-অভিমানী যশোররাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁ'র কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁ'র

মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ।"—একথা শক্তিধর প্রতাপের প্রতিভা-প্রকাশক ও বীরত্বব্যঞ্জক বটে, কিন্তু নাটকীয় রঙ্গস্থলে আমরা এই প্রতিভার পূর্ব্বসূত্র অনুসরণ করিতে পারি না। উপন্যাসের প্রতাপ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন—"কেবল মাত্র রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য মোগল অনুগ্রহ ক'রে (তাঁর) পিতা ও পিতৃব্যকে রাজা উপাধি দিয়াছেন ;— * * * (মোগল) ইচ্ছা করিলেই রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে(ন)। * * * এ উপাধি দেওয়া রাজার স্বকার্য্যোদ্ধারের একটা ফন্দি মাত্র। * * হাত পা মন অবধি যার অধীনতা-নিগড়ে আবদ্ধ, তা'র আবার সম্মান কি?" আপন অবস্থার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ প্রতাপ তাই প্রকৃত রাজসম্মান লাভাশায় মনে মনে 'মহাব্রত' অবলম্বন করিয়াছেন, সেই মহাব্রতের অনুষ্ঠানকল্পে 'মরণভয় তুচ্ছ করিয়া' শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে মৃগয়াজীবন সার করিয়াছেন। নাটকীয় প্রতাপের হস্তে 'রাজদণ্ড' প্রদানের কর্ত্রী মোগলের 'পররাজ্যলোলুপ'তা বা তাহাদিগের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত 'দুর্ব্বলের আশ্রয়ভিক্ষা'র সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য আমাদিগকে ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। মোগলপ্রতিনিধির অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রসাদপুরের দরিদ্র প্রজাকুল পরদুঃখকাতর প্রতিবাসী শঙ্করের শরণাপন্ন,—তাই সেই 'পর্ণকুটীরবাসী' বীর ব্রাহ্মণের হৃদয় উদ্বেলিত, তিনি ভাবিয়া আকুল—"ভীরু, পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর, বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই ক'রতে পারে না!" সেই আকুলতার আবেগে তিনি সুযোগ্য শিষ্যহস্তে হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভার সমর্পণ করিয়া অত্যাচারনিবারণের উপায়ান্বেষণে গৃহত্যাগী। শঙ্কর-প্রতিভা-প্রস্ফুরণের এই সুন্দর উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রতাপ-চরিত্র-বিকাশের তেমন কোন উপকরণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

নাটকীয় প্রতাপচরিত্রের দ্বিতীয় পরিচয়—তাঁহার আগ্রাযাত্রার পূর্ব্বে

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নিকটে বিদায়গ্রহণকালে। এস্থলে তাঁহার চরিত্রে বাঙ্গালীসুলভ কূপমণ্ডূকত্বেরই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্রা যাইতে বা "জ্ঞান লাভের জন্য কিছুকাল সেখানে থাকিতে" হইবে বলিয়া তিনি বড়ই ব্যাকুল, তাই গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া আক্ষেপ করিতেছেন— "প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুত্তলি কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হ'য়েও, আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী * * * কোন্ অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পরগৃহে, নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা ক'রবো।" আর বুঝিতে পারা যায়, তিনি লোকচরিত্র-অবধারণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরচিত্তের প্রতি অযথা সন্দিহান। যে বসন্তরায় কেবল অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-ভক্তির অনুরোধে, ঘোর অনিচ্ছায়, প্রতাপের বাধাকাঙ্ক্ষী পিতার অন্যতম প্রস্তাবে তাঁহাকে আগ্রায় পাঠাইতে বাধ্য, যিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাসন্নিধানে অকপটে বলিতেছেন,—"যদি প্রতাপ হ'তে * * আমার জীবননাশ হয়— এমন কি আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাক্‌লে * * আমার একটী গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থাক্‌বে," সেই ফলাকাঙ্ক্ষাপরিশূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ খুল্লতাতের দেবদুর্লভ চরিত্র কিছুমাত্র না বুঝিয়াই প্রতাপ অন্তঃপুরে পত্নীসমক্ষে বলিতেছেন,—"এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা-লাভ ক'রলুম। বুঝলুম কপটভালবাসায় গা ঢেলে এতকাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝতে পারিনি। * * * আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। * * * খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো। * * * আমি বসন্তরায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।"

শুধু তাহাই নহে,—শিশু উদয়াদিত্যও চরিত্র অপেক্ষা যে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সেই জীবনের আশঙ্কায় তিনি সুকুমারমতি বালকের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত করিতেছেন,—বাঙ্গালীসুলভ জ্ঞাতিবিরোধের বিষময় বীজ রোপণ করিতেছেন।

লোকচরিত্র অবধারণকল্পে প্রতাপ অপেক্ষা শঙ্করের শক্তি অধিক। আজীবন বসন্তরায়ের বাৎসল্যে লালিত হইয়াও প্রতাপ পিতৃব্যের সরলতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী; কিন্তু অত্যল্পকাল রাজপরিবারের সংসর্গে আসিয়াই শঙ্করের স্থির বিশ্বাস—"ছোট রাজার মুখেও যা, মনেও তাই।" – 'সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ' বুঝিয়াছেন, "সদুদ্দেশ্যে ছোট রাজা (প্রতাপকে) আগ্‌রা পাঠাচ্ছেন;" 'কায়স্থবুদ্ধি' প্রতাপের ধারণা—"বড় রাজা ছোট রাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোট রাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ ক'রেছেন। * (প্রতাপকে) যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন। (তাঁহাকে) বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়। * * * ছোট রাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাক্‌তো, তা'হ'লে কি তিনি (প্রতাপের) হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তা'তে হরিনামের মালা জড়িয়ে দেন।"—দূরদর্শী শঙ্কর যথার্থই ভাবিয়াছিলেন, "ধার্ম্মিক স্বার্থশূন্য দেবহৃদয় বসন্তরায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, * * * তা'হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝ্‌ছি না।"

আগ্রায় নির্ব্বাসন (?) কালে প্রতাপের কোন কার্য্য আমরা নাটকে দেখিতে পাই না.—উপন্যাসে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাস ইতিহাস না হইলেও, ধারাবাহিক আখ্যায়িকা বর্ণনকল্পে নাট্যকারের অপেক্ষা উপন্যাসলেখকের ক্ষেত্র প্রশস্ত। নাট্যকার বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থল দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত, উপন্যাসলেখক ঘটনার পারম্পর্য্য আরও বিশদ করিয়া বর্ণন করিতে যত্নবান। নাটকীয় প্রতাপ খুল্লতাতের অভিপ্রায়ে সন্দেহ বশতঃ 'জ্ঞানলাভের জন্য কিছুকাল' আগ্রায় থাকিবার প্রস্তাবে ভ্রূকুটি সঞ্চালন করিলেও, "একাদিক্রমে তিন চারি বৎসর কাল" তথায় থাকায় তাঁহার "প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ" হইয়াছিল। মনে মনে উচ্চ আশা পোষণ করিলেও, তিনি ইতঃপূর্ব্বে, যশোরে অবস্থানকালে,

* এটুকু খাটি ইংরাজি ভাব—বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত মাত্র।

শ্যেনসংহার ভিন্ন 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধি' প্রকাশের অপর কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই। আগ্রায় গিয়া তাঁহার সে সুযোগ উপস্থিত হইল,—"(তিনি) অতি অল্প দিন মধ্যে সম্রাটের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত মিশিলেন। মিশিয়া, মোগলদিগের রীতি-নীতি, আচারপদ্ধতি, স্বভাব-সংস্কার—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইলেন। কোন্ স্থানে মোগলের মহত্ত্ব আর কোথায় বা মোগলের ক্ষুদ্রত্ব,—সেটি বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। * * * (তিনি ক্রমে) কুমার সেলিমের নিকটও বিশেষ পরিচিত হইলেন। * * * (পরন্তু) একদিনের একটি সামান্য ঘটনায় * * * প্রতাপ সম্রাটের হৃদয়ের উপর প্রগাঢ় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তিনি আকবরচরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন—আকবরের সেই অতি সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইলেন;—এবং সেই অবসরে প্রতাপ জীবনের চির আশা ও প্রাণের দারুণ তৃষা মিটাইবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।"

এই 'আশা' ও 'তৃষা' মিটাইবার মূলে আমরা কেবল প্রবল রাজ-বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিতে পাই।—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া 'ভক্তি বিশ্বাস' পাইবার 'সর্ব্বথা' যোগ্য না হইলেও, আকবর 'অন্যান্য যবন নরপতির তুলনায়' অন্ততঃ 'মন্দের ভাল' ছিলেন। বিশেষতঃ, প্রতাপের প্রতি ব্যবহারে, সম্রাট্ যথেষ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রতাপের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বিশেষ প্রিয়চক্ষে' দেখিতেন; "এই প্রিয় দৃষ্টি হইতে স্নেহ, ভালবাসা, আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, একে একে সকলই" আনিয়াছিল; অধিক কি,—তিনি প্রতাপের কথায় বিশ্বাস করিয়া তদীয় পিতৃ-পিতৃব্য-অধিকৃত যশোহর রাজ্যে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে যশোহরের শাসনদণ্ড পরিচালন, পরন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের রাজ্যবিপ্লব প্রশমন ও অশান্তি-বহ্নি নির্ব্বাপণ, করিবার জন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে "দ্বাবিংশতি সহস্র সুদক্ষ

রণকুশল ও প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ" করিয়াছিলেন। রাজদত্ত এবম্বিধ পুরস্কারের প্রতিদান স্বরূপ প্রতাপ "বিপুল উৎসাহে মোগলরাজ্য-ধ্বংসের" চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উল্লিখিত কৃতঘ্নতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রতাপ কর্ত্তৃক মোগলরাজ্য-ধ্বংসচেষ্টার বিশিষ্ট হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকীয় প্রতাপের কথামত মোগল 'পররাজ্যলোলুপ' হইলেও, তৎপক্ষে তৎকালীন বাঙ্গালীর অভিযোগ করিবার বিশেষ হেতু ছিল না। অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত স্বরাজ্যের উদ্ধারচেষ্টা সাধুসম্মত বটে; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বাধীনতা এই ঘটনার বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল—পাঠানের হস্ত হইতে এখন তাহা মোগলের অধিকৃত, এই মাত্র প্রভেদ। উভয় ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী করদাতা মাত্র, আর অভিরামস্বামীর মুখে আমরা শুনিয়াছি— "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।" অতএব বাঙ্গালীর নিকটে মোগল সর্ব্ববিষয়েই রাজমর্য্যাদা লাভের যোগ্য। মোগলরাজের কৃপায় প্রতাপের পিতৃ-পিতৃব্যের প্রতিপত্তিরও পরিসীমা ছিল না;—কেবল "কলমের খোঁচে দপ্তরখানায় বসিয়া হিসাব নিকাসের" জোরে তাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন— আজিকালিকার ন্যায় অন্তঃসারশূন্য 'রাজাবাহাদুর' নহে, স্থানীয় শাসনদণ্ড পরিচালনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজা। এ অবস্থায় মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ রাজবিদ্রোহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সত্য বটে তখন দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তদানীন্তন মোগলরাজপ্রতিনিধির অত্যাচারে প্রজাকুল স্থানে স্থানে উৎপীড়িত হইতেছিল, এবং তাহাতে শঙ্করের ন্যায় স্বদেশভক্তমাত্রেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠা স্বাভাবিক—তাঁহার প্রতিবিধানকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করাও দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য সম্রাট্ স্বয়ং দোষী ছিলেন না;—"অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে প্রজা যখন (তাঁহার) কাছে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হ'ত, তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলা

* দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর সহায়তায় (তাঁহার) কর্ম্মচারী (তাঁহাকে) বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেতো। (তিনি) কিছু বুঝ্‌তে না পেরে কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতিকারে অক্ষম (হ'য়েছেন)*। কখন কখন অত্যাচারের কথা (তাঁহার) কাণের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে।" এরূপ অবস্থায় প্রতীকারকল্পে ব্যবস্থাসঙ্গত প্রণালী (constitutional way) অবলম্বনপূর্ব্বক সম্রাট্‌সমীপে প্রকৃত ঘটনা জানাইলে নিশ্চয়ই সুফলের সম্ভাবনা ছিল। প্রতাপের ভাগ্যে তৎপক্ষে সুন্দর সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি সম্রাটের যেরূপ বিশ্বাসভাজন ও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় প্রতিনিধির হস্তে করভারাক্রান্ত প্রজার দুর্গতির কথা যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রতিবিধানের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিলে সম্রাট্ নিশ্চয়ই তদ্রূপ বিধান করিতেন। প্রতাপ তৎপরিবর্ত্তে আশ্রয়দাতা সম্মানকর্ত্তা সম্রাটের রাজ্যধ্বংসের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চেষ্টায় তিনি মেকিয়াবেলীয় মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন— "বিনা কৌশলে, বিনা কূটনীতির পরিচালনায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। * * * রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি বড় বিষম ক্ষেত্র। খাঁটি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মজীবন লইয়া এ ক্ষেত্রে যিনি বিচরণ করিব মনে করেন, তাঁহার ইহকাল পরকাল—দুইই নষ্ট হয়। * * * রাজনীতি-ক্ষেত্রে * * * ধার্ম্মিকের ধর্ম্মজীবন লইয়া বিচরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।" * তাই তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সম্রাট্‌সমক্ষে অসত্য ও প্রতারণার প্রকটমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন,—যশোররাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পিতা ও পিতৃব্যকে অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার সনন্দ সংগ্রহ করিলেন, প্রতাপগতপ্রাণ পিতৃব্য মহাশয়কে 'জ্ঞাতিবিরোধী' বলিয়া

---

* তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর হইয়া আমরা এক্ষণে ইংরাজরাজের রাজনীতিচক্রকে political hypocrisy বলিয়া অভিযোগ করি।—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

পরিচয় দিলেন, এবং সম্রাট্‌দত্ত সৈন্যসাহায্যে তাঁহারই ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতাপচরিত্রের পরবর্ত্তী অধ্যায় অধ্যয়নের জন্য আমরা পুনরায় নাটকের অনুসরণ করিলাম। এ অধ্যায়ে তিনি বিষয়বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। এই বিষয়বিভাগ ব্যাপারে প্রতাপের অধীরত্ব, স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণসমূহ পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। রাজ্যভাগে রত হইয়া তিনি এতই অধীর যে, তাঁহার পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ মন্ত্রণা-কুশল শঙ্করের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত 'অপেক্ষা' সহিল না,—তিনি স্বার্থান্ধ হইয়া পিতৃসাহায্যে আপন অংশে দশ আনা রাখিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক আয়ের চাকসিরি পরগণা চক্ষুলজ্জায় খুল্লতাতকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—স্থানকাল বিবেচনায় রাজ্যরক্ষার্থ উহার প্রয়োজনাধিক্য চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। পুনশ্চ, স্বহস্তে বিভাগ করিয়া যে সম্পত্তি খুল্লতাতকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, "যেমন ক'রে হোক (সেই) চাকসিরি চাই"—শঙ্করের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না,—গৃহে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠোৎসব বিস্মৃত হইয়া, অভিবেককাণ্ড পণ্ড করিতে প্রস্তুত হইয়া, সুবুদ্ধি শঙ্করকে কেবল দেবসেবার যোগ্য আর আপনাকে রাজ্যপরিচালনের পারদর্শী স্থির করিয়া, প্রবল গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "শঙ্কর! * * যেমন ক'রে পার, চাকসিরি দাও।" পরে অধীরতার চরমে উঠিয়া তিনি "বৃদ্ধ বসন্তরায়কে প্রলোভনে, উৎকোচ-দানে বশীভূত" করিতে গেলেন, তাহাতেও সফলমনোরথ না হইয়া, তিনি "গুরুজনের অমর্য্যাদা" পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে বসন্তরায়ের "বক্ষবিদারণই হ'চ্ছে এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত ঔষধ"—তাঁহার সমক্ষে এই অযথা ও অনর্থকর কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এই ক্ষেত্রে বসন্তরায় যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, "বসন্তরায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার, প্রতাপ,

তা' হ'লে বঙ্গে স্বাধীনতা স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা সব পণ্ডশ্রম।" বাস্তবিক, লোকচরিত্র অধ্যয়নে অসমর্থতা প্রতাপ কর্ত্তৃক স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা বিফল হইবার অন্যতম হেতু।

তার পর প্রতাপচরিত্রের শেষ চিত্র—তাঁহার কোষ্ঠীর অব্যর্থ ফল—সেই লোমহর্ষণকর পিতৃপ্রাণবধ। বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য পক্ষপাতপূর্ণ বিষয়-বিভাগে সহোদরাধিক স্নেহাস্পদ বসন্তরায়ের প্রতি স্বকৃত কুব্যবহারের জন্য দারুণ লজ্জায় দেশত্যাগী' হইয়া প্রতাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু হায়! পিতৃস্থানীয় বসন্তরায় স্বপ্রতিষ্ঠিত যশোহরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই নিদারুণ হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। এ ক্ষেত্রেও প্রতাপের প্রকৃতিগত সেই পরচিত্তে অপ্রত্যয় ও পরিণামবোধ-শূন্য ধৈর্য্যক্ষয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। যে মুহূর্ত্তে ভূয়োদর্শী বসন্তরায় চাকসিরিরপথে শত্রুপ্রবেশের অন্তরালে নিজ পুত্র ও অমাত্যের 'বিশ্বাসঘাতকতা' অনুমান করিয়া বিষয়ে বিরাগবশতঃ "স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি প্রতাপকে দান" করিতে প্রস্তুত, পুষ্পচন্দনে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অমোঘাস্ত্র 'গঙ্গাজল' পর্য্যন্ত প্রতাপহস্তে উৎসর্গ করিতে উদ্যত, ধৈর্য্য-হীন প্রতাপ তখনও চিরপোষিত বিদ্বেষভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দেবদুর্লভ খুল্লতাতচরিত্র বুঝিতে অশক্ত,—তিনি 'ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ' করিয়াছেন ভাবিয়া 'গঙ্গাজলে'র আগমনপ্রতীক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, পরমভক্ত স্বদেশ-প্রাণ কুলতিলক বসন্তরায়কে শেষ মুহূর্ত্তেও "ভক্তবিটেল!—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার!" সম্বোধনপূর্ব্বক অতি নৃশংসভাবে তাঁহার জীবনসংহার করি-লেন। এই দৃশ্য চিন্তা করিলেও হৃদয় আতঙ্কিত হয়, পরন্তু প্রতাপের কাপুরুষতাময় কলঙ্কিত হস্ত স্মরণ করিলে অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রতাপ তদীয় মনঃকল্পিত 'ব্যাঘ্রবিবরে প্রবেশ' করিয়া সিংহত্ব প্রকাশের পরিবর্ত্তে জগৎসমক্ষে শৃগালত্বের লক্ষণ দেখাইলেন। যিনি বাহুবলে সমগ্র বঙ্গদেশ নিজের অধীন করিতে বদ্ধপরিকর, অন্তঃপুরনিবদ্ধ নিরস্ত্র নিঃসহায় বৃদ্ধের

বধসাধন অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কাপুরুষত্বের লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

সাহিত্যরথী স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।" প্রতাপের কার্য্যে সে সত্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে রাজদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহী, তাই তাঁহার আত্মনিধন অবশ্যম্ভাবী। এই অচিন্তনীয় গুরুহত্যা দর্শনে সাধ্বী শঙ্করপত্নী যথার্থই বলিয়াছিলেন, "প্রতাপ! আত্মহত্যা ক'র্‌লে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণধারণ ক'রে র'য়েছ, তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজর্ষিকে হত্যা ক'র্‌লে! তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল পরকাল—সব গেল!" বাস্তবিক, প্রতাপের সব গেল—রাজ্য গেল, সম্পদ গেল, বঙ্গ গেল, যশোর গেল, সুখ গেল, শান্তি গেল,—তিনি অচিরে মানসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া "দারুণ মানসিক কষ্টে * * দেহত্যাগ করিলেন।"

এই প্রবন্ধে আমরা কেবল প্রতাপচরিত্রের তামস অঙ্গ দেখাইলাম, শুভ্রাংশের আলোচনা করিলাম না। তাঁহার চরিত্রে স্বদেশপ্রাণতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আর্ত্তত্রাণপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অস্বীকার্য্য নহে; বিশেষতঃ, তাঁহার বিষাদময়ী লীলার শেষ অঙ্কে যখন তাঁহার মুখে কবি কৃপারের অমৃতবাণী শুনিতে পাই—

"হা বঙ্গ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।"

তখন তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ক্ষণেকের জন্য আমাদের মনে অভিমান জন্মে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁহার উপরিবর্ণিত কলুষিত চরিত্রের পার্শ্বে এ সমস্ত গুণ যেন পরিম্লান বোধ হয়। প্রতাপ অপেক্ষা শঙ্করের চরিত্রে আমরা ঐ সমস্ত গুণের অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাই। আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি

---

* "England! with all thy faults, I love thee still".
—*Task, Book ii.*

অনুসরণ করিয়া উপরে আমরা প্রতাপচরিত্রের যে চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কোনক্রমেই আদর্শযোগ্য হইতে পারে না।—"জ্ঞাতিবিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।" ভবানন্দের ন্যায় গৃহভেদী কুলাঙ্গার এই বিরোধবহ্নি উদ্দীপনকল্পে ইন্ধন সংযোগ করিলেও, প্রতাপ এই জাতীয় কলঙ্কের অতীত নহেন। আত্ম-বিধ্বংসী এই জাতীয়কলঙ্ক এখনও বাঙ্গালীর ও সমগ্র ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জায় জড়িত,—সেলিমবর্ণিত বাঙ্গালী-চিত্র এখনও বাঙ্গালী-চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। অন্য প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালী এখনও উৎকলবাসীকে 'উড়ে মেড়া' বলিয়া অবজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না; নিম্নবঙ্গের বিজ্ঞ সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষককে 'রামমাণিক্যে'র আসন দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না; বিহারী 'মহারাজা' বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে 'necessary evil' ভাবিয়া থাকেন; 'কল্‌কতইয়া'র প্রতি বিদ্বেষবশতঃ 'অসমীয়া' ভ্রাতা নূতন ভাষার আবিষ্কারে আনন্দ বোধ করেন। এমন হতভাগ্য দেশে কংগ্রেসই হউক আর কন্‌ফারেন্সই বসুক, 'বীরাষ্টমী' ব্রতই হউক আর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'ই প্রতিষ্ঠিত হউক, সীতারামের সমাদরই করি আর শিবজীর সম্মানই করি, প্রতাপের আদর্শ কিছুতেই আমাদের জাতীয় উন্নতির অনুকূল হইতে পারে না। আক্‌বরের কথামত "বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে" সত্য, কিন্তু বুঝিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে প্রশস্ত পথ অবলম্বন করে না—ইহাই বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য।

৫। কাব্যসুন্দরী—

ভ্রমর।

[কৃষ্ণকান্তের উইল।]

জয়ন্তী।

[সীতারাম।]

ভ্রমর।

[কৃষ্ণকান্তের উইল।]

যে কল্পনাময় লীলাক্ষেত্রে কুন্দনন্দিনীর অপরিস্ফুট প্রণয়াবেগের বিষময় পরিণাম, যাঁহার ভাবময়ী প্রতিভাবলে বনবিহারিণী কপালকুণ্ডলার জন্ম ও সংসারসুখের অভ্যুদয়েই অকালবিয়োগ, যাঁহার অতুলনীয় মানস-ক্ষেত্র হইতে পতিপ্রেমসোহাগিনী মনোরমার রমণীকুলদুর্লভ চরিত্র-বিকাশ ও তাহাতে (একাধারে) সকল গুণের সমাবেশ, যাঁহার অনন্য-সুলভ লিপিচাতুর্য্যে আয়েষা সুন্দরীর সুবিমল সরলতার উচ্ছ্বাস ও নিঃস্বার্থ প্রণয়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি, যাঁহার লিপিকৌশলে আজন্মদুঃখিনী চক্ষুহীনা মালিনীর পরিণামসুখ, ভ্রমরা সেই মনোমুগ্ধকর কল্পনা-কাননের নির্ম্মল প্রণয়-প্রসূনের পবিত্র সুধাপিয়াসী ক্ষুদ্র বিহঙ্গী।

প্রকৃতির প্রতিকৃতি সাধারণের সমক্ষে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাই কবিকল্পনার ক্ষমতাপরিচায়ক। ভাবের সহিত ভাষার সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণিতব্য চরিত্রের প্রস্ফুটতা সম্পাদন ও তদ্দারা পাঠকের চিত্তবৃত্তি পরি-মার্জ্জনকল্পে সহায়তা সাধন করা কবির অন্যতম কার্য্য। ভ্রমর-রচয়িতা সে কার্য্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে বিলক্ষণ পটু। তাঁহার কল্পনা আবেগময়ী, চরিত্রবিন্যাস অতুলনীয়, ভাষা ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা, লিপিচাতুর্য্য মনোমুগ্ধকর। আমরা তাঁহার যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়াছি, তাহাই হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। বঙ্গের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্যরসজ্ঞ সুলেখক তাঁহার "কাব্য-সুন্দরী"-গণের অনুপম সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া কাব্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। কুলবধূ ভ্রমরাকে তিনি স্পর্শ করেন নাই; কবির চিত্রণে সেই কুলকামিনীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও চিত্তবৃত্তি কিরূপ চিত্রিত ও স্ফুরিত হইয়াছে, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহারই আলোচনা করিব।

অন্যের অস্পৃষ্ট রমণীকে স্পর্শ করিয়া আমরা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইব কি না বলিতে পারি না, তবে ভ্রমর স্বয়ং সতীত্বের জীবন্ত মূর্ত্তি—এই ভরসা।

আমরা কুন্দের কমনীয়তা দেখিয়াছি,—তাহার মৃদু-মন্দ মধুরিমা, তাহার বিকাশোন্মুখ যৌবনসুলভ কোমলতায় নির্ম্মল প্রেমের সংমিশ্রণ ও শান্তিময়ী সরলতায় লজ্জাশীলতার মোহন মিলনে মোহিত হইয়াছি এবং পরিণামে গরলপানে শিরীষকুসুম স্বর্ণকান্তির বিকৃতি দর্শনে অবিরল অশ্রুপাত করিয়াছি। আমরা কমলমণির স্বামিসোহাগ ও দাম্পত্যসুখের পক্ষপাতী হইয়াছি ও তাঁহার মত রমণীলাভের নিমিত্ত কত সময় মনের ভিতর উদ্ভ্রান্ত বাসনার স্থান দিয়াছি। আমরা মনোরমার মনোরম মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি, অবসাদময়ী চিন্তার মধ্যেও উৎফুল্ল ভাবের প্রস্ফুটন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও স্বামীর বীভৎস অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার প্রতি মধুর তিরস্কার শ্রবণে বিস্মিত হইয়াছি এবং নারীরূপা দেবী ভাবিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত পূজা করিয়াছি। আমরা আয়েষার অগাধ প্রণয়সাগরের প্রশান্ত প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছি, তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছি এবং কবির কল্পনারাজ্যের প্রসার ভাবিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছি। কিন্তু এ সকলই অদ্ভুত (Romantic) ঘটনাবৈচিত্র্যে জড়িত। সংসারের দুর্লভ সামগ্রী লইয়া কবি কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, আর সেই স্রোতের বেগে পাঠককে 'হাবুডুবু' খাওইয়াছেন। এরূপ চরিত্র-চিন্তায় চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়, আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, আশার ক্ষোভ মিটে না, কি এক অব্যক্ত ভাবে হৃদয় আবিল হইয়া উঠে।

আমরা সকল সময়ে এরূপ ভাবের পক্ষপাতী নহি। যে মূর্ত্তি নিরন্তর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহা দেখিয়া কখন হাসি কখন কাঁদি, যাহাকে সমভাবে ক্রীড়ার পুত্তলি—পূজার সামগ্রী—করি, যাহার প্রতি

স্নেহ-ভালবাসা, অনুরাগ-বিরাগ, যুগপৎ প্রকাশ করিতে পারি, তাহাই অনেক সময়ে আমাদিগের অধিকতর আদরের বস্তু বোধ হয়। *ভ্রমর সেইরূপ স্নেহ-যত্নের সামগ্রী। আমরা কুন্দকে অপ্সরবালা ভ্রমে অনিমেষ দেখিয়া নয়নতৃপ্তির জন্য পাগল হইতে পারি, আমরা মৃণ্ময়ীকে বনলতা জ্ঞানে গৃহপার্শ্বস্থ প্রমোদকাননের সুষমাবৃদ্ধির জন্য যতনে রোপণ করিতে উৎসুক হইতে পারি, আমরা মনোরমাকে ভুবনমোহিনী দেবললনা ভ্রমে প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পূজা করিতে পারি, আমরা মুসলমানীর বিধর্ম্মী হিন্দুর প্রতি অপূর্ব্ব প্রেমানুরাগ এবং অতুল আত্মসংযম ও উদার স্বার্থত্যাগ দর্শনে তাহাকে প্রেমের উৎস জ্ঞান করিতে পারি, কিন্তু ইহাদের কাহাকেও গৃহসুলভ কুলবধূ ভাবিতে পারি না। ভ্রমর আমাদের সেই গৃহের শোভা কুলকামিনী, 'কালো-কোলো' প্রতিমাখানি, হিন্দু যুবার সুখের খনি। চেষ্টা কর, খুঁজিয়া লও, ঘরে ঘরে এরূপ গৃহলক্ষ্মী দেখিতে পাইবে,—অথবা, হতভাগ্য গোবিন্দলালের মত, পাইয়াও পাইবে না, সুখের স্রোতেও দুঃখের প্রতিঘাত হইবে।

সংসারে সুখের ভাগ নিতান্ত অল্প, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি গাহিয়াছেন—

'সকলি গ'ড়েছে বিধি, সুখ গড়ে নাই।'

রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী হইতে অন্নাম্নলাভকাতর ভিক্ষুক—সকলেই অল্পাধিক দুঃখের দাস; দুঃখের অবসাদময়ী বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়েন নাই, এরূপ লোক জগতে দুর্লভ। ভ্রমরের ভাগ্যেও সেই দুঃখের তাড়না প্রবল দেখা যায়। ভ্রমর সুখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; বাল্যে, কৈশোরে, পিতামাতার যত্নের ক্রুটী হয় নাই, ধনবান সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ দ্বারা তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্যপালনেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। শ্বশুরালয়েও শ্বশ্রূর যত্ন, জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও স্বামীর সানুরাগ সোহাগের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার ভাগ্যে সে সুখ চিরস্থায়ী হইল

না ; সুখের প্রথমোচ্ছ্বাসেই দুঃখের আবিলতা মিশিল, সোহাগের প্রস্ফু-টনেই বিরাগের প্রতিরোধ ঘটিল, পতিপ্রেমসুখলতা অঙ্কুরেই দলিত হইল। পোড়াকপালী রোহিণী আসিয়া তাহার সুখের কণ্টক হইবে, কে স্বপ্নে দেখিয়াছিল? গোবিন্দলালের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ব্যভিচারের কালিমা পড়িবে, কে ভাবিয়াছিল? কৃষ্ণকান্তের উইল এত অনর্থ ঘটাইবে, কে জানিয়াছিল?

ভ্রমর রূপের প্রভায় গৌরবান্বিতা নহে। তাহার তিলফুল নাসা নাই ঈষৎ সুবঙ্কিম গ্রীবা নাই, আকর্ণ নয়নের অপরূপ কটাক্ষভঙ্গিমা নাই, চলনের চাপল্য নাই, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের নয়নবিদগ্ধী দীপ্তি নাই। তাহার বর্ণ কৃষ্ণ, তাহার নয়ন লজ্জাবনত, তাহার মুখ বালিকাসুলভ মধুরিমাময়; যাহা সকল ঘরে সহজে মিলে, ভ্রমর সেইরূপ "পাঁচপাঁচী" কুলবধূ। অথচ তাহাতে যাহা আছে, সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না, রমণীমণ্ডলে তাহা দুর্লভ। তাহার সরলতাপূর্ণ মধুর আলাপ, সংসারের সর্ব্বজীবে সমান দয়া, পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা, ভুবনে অতুল। তাহার সহিত যে মিশিয়াছে সেই বুঝিয়াছে, ভ্রমর সতীত্বের শ্বেতপদ্ম;—পাপিষ্ঠা রোহিণীও তাহা বুঝিত, গোবিন্দলালের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তাহার উন্মত্ত চিত্তে আমরা রোহিণীর সেই হৃদ্গত ভাবের ছায়া দেখিতে পাই।

রমণী সংসার-সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষের প্রকাশ সম্ভবে না। রমণীবিহীন সংসার মরুভূমি। অতুল বিভব-সম্পন্ন হও, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার হৃদ্গত কর, সুকীর্ত্তির উচ্চ মঞ্চে অধিরোহণ কর,—তোমার রমণীবিহীন জীবনে শোভা নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই,—তোমার হৃদয় নীরস, নিস্পন্দ, নিশ্চল। আবার সমস্ত দিন মূঢ়োচিত কঠিন পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান কর, দিনান্তে শাকান্নে উদরপোষণ কর, সমাজের সূক্ষ্ম তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে না পার, বিজ্ঞানের অপার মহিমা না বুঝ, তথাপি প্রিয়তমার

সরলতাময়ী প্রেমমূর্ত্তি দর্শনে তোমার স্বর্গসুখ—দরিদ্রতায়, অজ্ঞানতায়, অমান্ধকারের মধ্যেও প্রিয়া-সহবাস-জনিত সুখতারার ক্ষীণালোক তোমার অন্তরে ক্ষণেকের জন্য পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। কিন্তু সংসারে সকল বস্তুই ভাল-মন্দে মিশ্রিত। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সঙ্ঘটন না হইলে পার্থক্যজ্ঞান জন্মে না; দুঃখ না হইলে সুখের কল্পনা মনোমধ্যে স্থান পায় না। রমণী-প্রকৃতিও সেইরূপ ভাল-মন্দে জড়িত। রমণী হইতে সংসারের যেমন অপার আনন্দ, বিমল জ্যোতিঃ, অনুপম শোভা,—সেইরূপ রমণীই আবার সংসারের কণ্টক, বিপদের মূল, হৃদয়দগ্ধকারিণী ভীমরূপিণী রাক্ষসী। রমণী ব্যতীত যেমন সংসার চলে না, আবার রমণী হইতেই সংসার সেইরূপ শ্রীভ্রষ্ট হয়। গোবিন্দলালের ভাগ্যে এই দ্বিবিধ প্রতি-দ্বন্দ্বী ভাবাপন্ন স্ত্রীচরিত্রের সংযোগ হইয়াছিল। রোহিণীর কলঙ্কিত চিত্র না দেখিলে আমরা ভ্রমরের পবিত্রতা বুঝিতে পারিতাম না; ভ্রমর গৃহলক্ষ্মী—রোহিণী কালসাপিনী; ভ্রমর অমৃতপ্রসবিনী মাধবীলতিকা,—রোহিণী গরলোদ্গারিণী বিষলতা; ভ্রমর সুধামাখা পূর্ণশশী,—রোহিণী বিভীষিকাময়ী ধূমতারা।

সতীত্বই নারীজীবনের শোভা। পতিগতপ্রাণা কুলললনা সংসার-সুখের চরম সীমা। সাধ্বী সতী পরম শত্রুকেও ভয় করে না, পতির প্রসাদলাভের জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিতা হয় না। সতীত্বের সমুজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কামাসক্ত নরপিশাচগণ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হয়। ভ্রমরের চরিত্র সেই পবিত্র পতিব্রতারত্নে পূর্ণালঙ্কৃত। পতিই তাহার জপ, পতিই তাহার তপ, পতিই তাহার প্রাণ, পতিই তাহার ধ্যান, পতিপূজাই তাহার ইহসংসারের সার ধর্ম্ম। সে ইহজীবনে "স্বামীর ভালবাসা ব্যতীত আর কিছু ভাল বাসে নাই,—আর কিছু কামনা করে নাই, আর কিছু কামনা করিতে শিখে নাই।" সে দেবতাকে নিষ্ঠুর ভাবিয়াছে, তবু পরপ্রণয়াসক্ত পতিকে নিষ্ঠুর ভাবিতে পারে নাই। আবার

ভ্রমর কমনীয় সরলতার জীবন্ত মূর্ত্তি। আমরা তাহার বাল্যসুলভ কোমলতার কখন অপচয় দেখি নাই। ভ্রমর যৌবনের পূর্ণ সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহার শাশুড়ী কাশীধামে যাত্রা করিবেন, তাহাকে সংসারের কর্ত্রী করিয়া যাইবেন, তথনও সে বালিকা। ভ্রমর সরল প্রাণে, ব্যাকুল মনে, শাশুড়ীকে বলিল—"মা, আমি বালিকা, আমায় একা রাখিয়া যাইও না, আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি?" ভ্রমরের শাশুড়ী কত বুঝাইলেন, ভ্রমর কিছুই বুঝিল না, কেবল বালিকার ন্যায় অজস্র কাঁদিতে লাগিল। এমন সরল প্রাণে কুটিলা রোহিণী আসিয়া কেন দাগাদারি করিল? তাহার ভাগ্যে কেন এমন বিষময় পরিণাম ঘটিল?

পুণ্যের পবিত্র স্রোতে পাপের ঈষৎ আবিলতাস্পর্শেই মানুষকে পশু করিয়া তুলে, তাহার হৃদয়ে দেবভাব ঘুচিয়া প্রেতত্ব জন্মে, সুখ-শান্তির মধুরতা গিয়া চিত্তচাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হয়। গোবিন্দলালের দেবোপম পবিত্র চিত্তে রোহিণীর ছায়া পড়ায় তাহার উদারতা, সরলতা, সদাশয়তা, প্রেমপ্রবণতা, গুণগ্রাহিতা—সকলই অতল জলে মিশাইয়া গেল; তাহার অন্তরে রূপতৃষ্ণা দেখা দিল, ভোগলালসা প্রবল হইল, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কুক্ষণে কোকিল 'কু-উ' গাহিয়াছিল, কুক্ষণে রোহিণী বারুণীর জলে ডুবিতে গিয়াছিল, কুক্ষণে গোবিন্দলাল তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া তাহার রূপের ছটা দেখিয়াছিল, আবার কুক্ষণে গোবিন্দলাল জমিদারী দেখিতে গিয়া ভ্রমরের অবিচ্ছিন্ন প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল, সেই কু-অবসরে রোহিণী আসিয়া তাহার সহিত গোবিন্দ-লালের প্রেমানুরাগের অলীক আন্দোলন ভ্রমরের মনে সত্য জ্ঞান করাইয়া তাহার কোমল প্রাণে সন্দেহের তরঙ্গ তুলাইয়াছিল। রমণী সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, সহ্য করিতে পারে, কিন্তু অভিমানিনী কুলকামিনী স্বামীর পরদারাসক্তি প্রাণ থাকিতে সহিতে পারে না; মানবহৃদয়তত্ত্বজ্ঞ কবি সত্যই বলিয়াছেন—"ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমং।" ভ্রমরের হৃদয়ে

গোবিন্দলালের রোহিণীপ্রেম দারুণ শেল হানিল, অসহ্য বিষের বাতি জ্বালাইয়া দিল। ক্ষোভ, দুঃখ, অবসাদ, নিরাশা, ঘৃণা—সকলে মিলিয়া ভ্রমরের হৃদয় খুলিয়া খাইতে লাগিল। গোবিন্দলালের সুখের প্রমোদ-উদ্যানে জীবনশোষক কালকূটের বীজ অঙ্কুরিত হইল।

স্বামীর বাক্যে ভ্রমরের দৃঢ় বিশ্বাস। রোহিণীর চরিত্রঘটিত কত কুকথা সে কত লোকের মুখে শুনিয়াছিল, তথাপি রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের অন্তরে সে বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। "সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না, কেবল গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" যখন রোহিণী স্বয়ং আসিয়া তাহার চরিত্রদোষের কথা ভ্রমরকে বলিল, গোবিন্দলালই তাহার সেই দোষের আকর—চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল, তখনও, বোধ হয়, ভ্রমরের বিশ্বাস টুটিত না, যদি গোবিন্দলাল সে সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, যদি রোহিণীর কথা মিথ্যা—ইহা কেবল তিনি মুখের কথায় একবার ঘৃণাক্ষরে প্রকাশ করিতেন। গোবিন্দলাল ছিলেন না বলিয়াই এত অনর্থ ঘটিল। প্রেমের বিচ্ছেদে—মিলনের পার্থক্যেই যত অনর্থ ঘটে।

ভ্রমরের মন উদার, প্রশস্ত, প্রশান্ত। সামান্য কথায় তাহার মন উদ্বেলিত হয় না; ঈষৎ বায়ুহিল্লোলে মহোদধির তরঙ্গ বাড়ে না। যখন ক্ষীরি চাকরাণী গোবিন্দলালের চরিত্রদোষঘটিত জনশ্রুতি ভ্রমরকে আসিয়া বলিল এবং তাহার বিশ্বাস প্রতিপাদনের নিমিত্ত 'একে ওকে তাকে' জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, তখন ভ্রমর বিরক্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিল—"আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজী, যে আমার স্বামীর কথা পাঁচী চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব?"—রোহিণী-গোবিন্দ-বিষয়ক নিন্দাবাদ ভ্রমরের কর্ণে অসহ্য, ভ্রমরের হৃদয়ে অবিশ্বাস-যোগ্য; বিনোদিনীর কথাতেও তাহার বিরক্তি জন্মিল, সে "কিছু বলিতে না পারিয়া বিনোদিনীর ক্রোড়স্থ ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইয়া,

কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল।" অগত্যা বিনোদিনী ছেলে ভুলাইবার নিমিত্ত সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, ভ্রমরও অব্যাহতি পাইল। কিন্তু হতভাগিনী রোহিণীর কথায় আর তাহার অন্তর স্থির থাকিল না, নির্ম্মল জলে স্রোতের আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিল, আর ভাটা পড়িল না, আর সে আবিলতা ঘুচিল না। ভ্রমরের উদাস মনে ভ্রান্তি ঢুকিল, সে পরিণাম না ভাবিয়া গোবিন্দলালকে পত্র লিখিল, চিরারাধ্য দেবতার মুখে আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া কৌশলে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, চিরকালের জন্য সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিল। গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া আর ভ্রমরকে দেখিতে পাইল না, ভ্রমরের পত্রের মর্ম্ম তাহার 'হাড়ে হাড়ে' লাগিয়া গেল, তাহার অন্তরস্থ 'ভোমরা' মণির শূন্য ঘরের দ্বারে রোহিণীর 'চালা' বাঁধিয়া দিল, কঠোরে কঠোর কঠিন করিয়া তুলিল, ইহজীবনে আর তাহা কোমল হইল না।

কুলগ্নে কৃষ্ণকান্ত ইহলীলা ত্যাগ করিলেন, পোড়া উইল আবার বদলাইয়া গেলেন, গোবিন্দলালের পাপিষ্ঠ অন্তরে অধিকতর ঘৃণা-হিংসা বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। গোবিন্দলালের জননী অপরিণামদর্শিনী বঙ্গগৃহিণী, সংসারের শুভাশুভ চিন্তা না করিয়া কাশীবাসিনী হইতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন, গোবিন্দলালেরও ভ্রমরময় গৃহত্যাগের বাসনা পূরণের বিলক্ষণ সুযোগ হইল। ভ্রমর গোবিন্দলালের কত আরাধনা, কত মিনতি, করিয়াছিল, তাহার পাষাণহৃদয় আর কিছুতেই দ্রব হইল না। ভ্রমর যখন সরলমনে উদাসপ্রাণে গোবিন্দলালকে বলিল—"আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। * * * আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল— * * * অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।" তখনও তাহার দয়া হইল না, সে তখন রোহিণীকে ভাবিতেছিল—"এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি,

এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব," মনে মনে স্থির করিয়াছিল—সে অসঙ্কোচে বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" আবার যখন কাশী যাইবার সময় "ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও" তখনও গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা অক্ষুণ্ণ, সে অনায়াসে উত্তর দিল—"আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।" ভ্রমরের পতিভক্তি, পতির প্রতি প্রেমানুরাগ তখনও অক্ষয়, অটুট ; সে তখনও বলিতেছে—"যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। * * * তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই,—রোহিণীর নও।" সতীর ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইল, অন্তিম দশায় ভ্রমর আবার স্বামীর চরণরেণু মাথায় দিয়া, স্বামীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, স্বামীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল বাস্তবিকই রোহিণীর নহে—ভ্রমরের ; "যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।"

আমরা ভ্রমরের জীবনের প্রত্যেক অঙ্কে তাহার নির্ম্মল পতিব্রতাগুণের, পবিত্র সতীত্বরত্নের, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শায়িতা, জীবনের মুমূর্ষু অবস্থা, তখনও সেই স্বামী ভিন্ন তাহার অন্য কোন চিন্তা নাই ;—দেবতার দিকে লক্ষ্য নাই, আত্মীয় বন্ধুর কথা স্মরণ নাই, কেবল স্বামিচরণ দর্শনই তাহার একমাত্র ভিক্ষার সামগ্রী। ভ্রমর পার্শ্বস্থিতা ভগিনীকে কাঁদিয়া বলিল—"একবার দেখা দিদি ! ইহজন্মে আর একবার দেখি, এই (অন্তিম) সময়ে আর একবার দেখা।" সতীর মনস্তুষ্টির জন্য হতভাগ্য স্বামী সাত বৎসরের পর আবার আসিয়া দেখা দিল ; তখন ক্ষুণ্নমনে আশা নিবৃত্ত করিয়া সতীত্বের স্বর্ণকান্তি পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। সে সময়েও সতীর অন্য কোন ভিক্ষা নাই, কেবল "আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন (স্বামীসুখে) সুখী হই"—এই ভিক্ষা।

রোহিণীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীহত্যাপাপে যে শরীরের কিছু হয় নাই, আজি সতীত্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে গোবিন্দলালের সেই কলুষিত দেহ দগ্ধ হইয়া গেল। যেখান হইতে পাপের উৎপত্তি, সেই খানেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলাল আবার বহুকালের পরিত্যক্ত সেই পুষ্পোদ্যান, সেই বারুণীতট, দেখিতে গেলেন; তাঁহার অস্নাত অভুক্ত দেহে, তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, সন্ধ্যাসমাগমে আবার রোহিণীর বিভীষিকাময় ভৌতিক উচ্চরব প্রবেশ করিল—"এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে, আমি ডুবিয়াছিলাম।" গোবিন্দলালও উন্মত্তভাবে অন্তরীক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমিও কি ডুবিব?" আবার যেন তাঁহার কর্ণে বাজিল—"হাঁ আইস। * * * প্রায়শ্চিত্ত কর, মর।" গোবিন্দলাল তখন মূর্চ্ছিতাবস্থায় মানসচক্ষে দেখিলেন যেন জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদয় হইয়া বলিল,—"মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" বাস্তবিক, সতীর স্বর্গপ্রেরিত সেই অমোঘ বাণী হৃদয়ে পোষণ করিয়া গোবিন্দলাল প্রাণধারণ করিলেন এবং ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপনপূর্ব্বক ভ্রমরের অপেক্ষা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষা পবিত্র, শান্তি লাভ করিয়া "ভ্রমরাধিক ভ্রমর" অতুল সম্পত্তিলাভোদ্দেশে লোকলোচনের অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। ভ্রমর-গোবিন্দলাল-কাহিনী-জড়িত দৃশ্যপটে এইরূপে চিরদিনের জন্য যবনিকা পড়িল।

ভ্রমর হিন্দুকুলকামিনীর অকৃত্রিম সরলতা ও পতিব্রতার সঙ্গমস্থল। শচীকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া, রোহিণী-গোবিন্দলাল-সংস্পৃষ্ট সেই পুষ্পবাটিকায়, প্রমোদভবনের পরিবর্ত্তে, একটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে সতীত্বের স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপনদ্বারা প্রকৃত আত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন, যথার্থ ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সতীত্বের সারমর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তিনি "যে সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান

হইবে,” তাহাকে সেই স্বর্ণপ্রতিমা দান করিবেন, এই কথা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিমাপদতলে খোদিয়া দিয়াছিলেন। আমরাও কায়মনে প্রার্থনা করি—

যেন প্রত্যেক হিন্দুকুলললনা সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান হয়েন।

তাহা হইলে আমরা সহস্রবিধ লাঞ্ছনার মধ্যেও সীতা-সাবিত্রীর সন্তান বলিয়া ক্ষণেক আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব।

জয়ন্তী।

[সীতারাম।]

কবির পথ প্রশস্ত, দিগন্তপ্রসারিত। প্রতিভাবলে তিনি ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, নীচ হইতে উচ্চে, সান্ত হইতে অনন্তে উঠিতে পারেন। "জগতের সার সুখ প্রতিভা ; প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।" যে প্রতিভা-বলে কুন্দ-সূর্য্যমুখীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, যাহার তেজে ভ্রমর-মৃণ্ময়ী জন্মিয়াছিল, সেই প্রতিভাই প্রফুল্লমুখী গড়িয়াছে, আবার সেই প্রতিভা-গুণেই বঙ্গসাহিত্য জয়ন্তীর ভস্মাবৃত অনিন্দ্য রূপমাধুরী,—সংসারাসক্তি-বিরহিত, ভগবৎপ্রেমে চিত্তসমর্পিত, নির্ম্মল নিষ্কাম ধর্ম্মে নিয়োজিত, ভৈরবী বেশ—দেখিতে পাইয়াছে। প্রতিভার স্রোতঃ ফিরিয়াছে, মহান্ হইতে মহত্তর পথে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রবল স্বদেশানুরাগ ও বিশুদ্ধ শান্তিরসাস্পদ নিষ্কাম ধর্ম্ম সমসূত্রে জড়িত হইয়া কবির প্রতিভা নিত্য নব মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। 'আনন্দমঠে' এ স্রোতের উৎপত্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'তে তাহার বিবৃতি, 'সীতারামে' উহার পরিণতি। 'দেবী চৌধুরাণী'র উপসংহারে কবি প্রফুল্লমুখীর মুখ দিয়া 'গীতা'শাস্ত্রোক্ত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত, এই কথা বলাইয়াছিলেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমরা কবির প্রসাদে বর্ষে বর্ষে দুষ্টের দমন, সাধুর পালন, ধর্ম্ম-সংরক্ষণের অবলম্বন, ভগবানের অবতারস্বরূপিণী শান্তিরূপিণী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। গৃহিণী সাজে সাজাইয়া কবি প্রফুল্লমুখীর দ্বারা প্রজাবিদ্রোহের শান্তিসংরক্ষণে, নিষ্কাম কর্ম্মের জ্বলন্ত শিক্ষাদানে, যত্ন করিয়াছিলেন ; আবার শ্রীকে অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর দ্বারা

মুসলমানের*অরাজকতা নিবারণ, ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য-সংস্থাপন, এবং পবিত্র কর্ম্মযোগের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম—এই তিনখানি ভাবুকতাময় কাব্যেরই ভিত্তি কবি ঐতিহাসিক অস্ফুট একটু ছায়ার উপর স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কোন খানিকেই ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিতে বলেন নাই। বস্তুতঃ, ঐতিহাসিক দুই একটী নাম, ঘটনার ঈষৎ একটু আভা, ভিন্ন ঐতিহাসিকতা উহাতে কিছুই নাই। "অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান" হওয়াই কবির কার্য্য—ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

'গীতা'শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা কবি 'সীতারাম' কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ইতর-বিশেষিতা অনুভব করিতে না পারিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন সন্দিগ্ধ চিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মযোগের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করেন, তখন অনন্ততত্ত্বজ্ঞ লোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে কর্ম্মযোগের মূলসূত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন, কবি প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, শ্রীকে কর্ম্মযোগাভ্যাস শিক্ষা দেওয়াই 'সীতারাম' কাব্যে জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর একমাত্র কার্য্য। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন মহান্ যোগসূত্রে সমগ্র গীতাশাস্ত্র গ্রথিত। কবির কল্পনাকৌশলে এই তিনই সমভাবে প্রধান বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ তিনের ক্রমবৈষম্য অনুভব করা যাইতে পারে। কর্ম্মই সাধনার প্রথম সোপান, ভক্তিতে তাহার অবস্থান, জ্ঞানে উহার পরিণাম। ঐহিক সুখদুঃখানুভূতি বিসর্জ্জন দিয়া, নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহকে বশীভূত করিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষায় বীতস্পৃহ হইয়া, ভগবানে আত্মমনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, নিষ্পাপ নির্ম্মল কার্য্যানুষ্ঠান করাই সাধনার মূল উপকরণ। ক্রমে ভক্তিসহকারে সেই নির্ব্বিকার পরমপুরুষে চিত্ত

প্রতিনিয়ত সমাহিত রাখিলে, সাংসারিক বাহ্য লালসা তিরোহিত হয়, কর্ম্মকাণ্ড শিথিল হইয়া পড়ে ও চিত্তের সমগ্র গতি ভগবৎপ্রেমে সংসক্ত হয়। তখন প্রকৃতির বিনাশ ঘটে, ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হয়, আত্মার সত্বা পরমাত্মায় বিলীন হয়। এই অবস্থাই জ্ঞানযোগ। এ কার্য্য একদিনে সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সিদ্ধি বা জ্ঞানলাভ হয় না। জয়ন্তী কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংযত করিয়া, সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানের সীমায় পঁহুছিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষায় শ্রী এখন কর্ম্ম অভ্যাস করিতেছেন, নিষ্কাম হইতে শিখিতেছেন, ভক্তিরসে ডুবিয়াছেন। সাধনার এই মহদুপকরণ দেশে দেশে বিঘোষিত হউক, জয়ন্তীর নিকটে সকলে নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা করুক।

"সীতারাম" কাব্যের দ্বিতীয় শিক্ষা 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ কয়েকটী শ্লোকে নিহিত। বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে আসক্তি হইতে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হইলে ক্রোধ উপজিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিবিপর্য্যয়, এবং বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে বিনাশ সংঘটিত হয়। রাগদ্বেষ-বিমুক্ত বশীকৃতচিত্ত পুরুষেরা আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়সম্ভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।—কবি সীতারামের চরিত্রে এই মহত্তত্ব জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সীতারাম এক সময়ে আপন জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া পরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন,—হিন্দুকে হিন্দু রাখা অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহার তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল,—বিজাতীয়ের অত্যাচার নিবারণের উপকরণ স্থির করিবার জন্য যাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষণেকের জন্য অন্তরাকাশে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—"অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা,

তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতিঃ, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে” যাঁহার চিত্ত সমর্থ হইয়াছিল,—“ধর্ম্মই ধর্ম্মসাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়” বলিয়া যাঁহার অন্তরে প্রবল প্রতীতি জন্মিয়াছিল,—শ্যামপুরের (ওরফে মহম্মদপুরের) সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা হইয়া, “বাহুবলে বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া,” সেই উদারচিত্ত সুকর্ম্মঠ সত্যনিষ্ঠ সীতারাম রায়ের চিত্ত বিকৃত হইল, ভোগলালসা প্রবল হইল, এই সুখের রাজ্যে শ্রীর সুখ-সমাগম দেখিতে, নন্দা রমার উপর তাঁহাকে পট্টমহিষী করিতে, সেই পরিত্যক্তা প্রেয়সীর সহিত প্রাণ ভরিয়া একবার প্রেমসহবাস করিতে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িল। বহুকাল পরে, অবস্থাপরম্পরায়, শ্রীকে নিকটে পাইয়াও তিনি সে লালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না,— তাঁহার রাজ্যের রাজমহিষী, গৃহের গৃহিণী, সেই সে-কালের শ্রী, না দেখিয়া “মহামহিমাময়ী দেবীপ্রতিমা’ দেখিলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, রূপরশ্মিতেজে নয়ন ঝলসিয়া উঠিল, কি এক অব্যক্ত ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না ; কত অনুনয়-বিনয়ে, কত কল কৌশলে, কত যুক্তি-তর্কে, তিনি শ্রীকে আপন মন্তব্য পথে আনিতে চেষ্টা করিলেন,—‘ডাকিনী’ শ্রীর মন কিছুতেই টলিল না, তিনি সুখের সংসারে সংসারী হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা ‘চিত্তবিশ্রাম’ প্রমোদভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইল ; সীতারাম বিষয়বৈভব ভুলিয়া, রাজকার্য্যপরিচালনকর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া, প্রতিনিয়ত শ্রীর নিকটে বসিয়া থাকিতেন ; শ্রী সর্ব্বসুখে নিস্পৃহ হইয়া অবিরাম ভগবৎপ্রসঙ্গালোচনা করিতেন, মধুর হরিনামের তরঙ্গ তুলিতেন,—রূপজ মোহে মুগ্ধ সীতারাম বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশতঃ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না, সে রসতরঙ্গে ডুবিতেন না, কেবল অনিমিষলোচনে বরবর্ণিনী শ্রীর রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেন, তাঁহার কোকিলনিন্দিত কলকণ্ঠের মধুরতায় বিভোর থাকিতেন, ভোগাকাঙ্ক্ষা ততই বলবতী হইত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর দেখিলেন, রাজ্য ধ্বংস হয় ;—

সীতারামকে কত বুঝাইলেন, তাঁহার মতি ফিরাইতে কত চেষ্টা করিলেন, কোন ফল ফলিল না; সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধা শ্রীও প্রজ্ঞাচক্ষুবলে রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা, রাজার আত্মবিস্মৃতির ফল, বুঝিতে লাগিলেন,—তিনিও সীতারামের মোহান্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এমন সময়ে দৈবগতিকে জয়ন্তী আসিয়া জুটিলেন; শ্রীর অপূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণতা হইল, মন্ত্রণার মন্ত্রী মিলিল, উভয়ে পরামর্শ করিয়া শ্রীর পক্ষে এই পাপ সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর স্থির করিলেন। কৌশলে শ্রীকে তাড়াইয়া জয়ন্তী 'চিত্তবিশ্রাম' ভবনের অবরোধস্থ হইলেন, অবাধবিচরণ-কারিণী বিহঙ্গী স্বসাধে শৃঙ্খলাবদ্ধা হইলেন। ভোগলোলুপ সীতারামের ভোগবাসনা পূরিল না, তাঁহার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি ভৈরবীকে শ্রী-নির্ব্বাসন-ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী স্থির করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের প্রকাশ্য স্থলে বিবস্ত্রা করিয়া চণ্ডাল-মুসলমান কর্ত্তৃক বেত্রাঘাত করাইতে কৃতযত্ন হইলেন। ক্রোধ, মোহ, আত্মবিস্মৃতি, বুদ্ধিবিপর্য্যয়, একে একে সমস্তই পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল; ক্রমে ধ্বংস—এত আয়াসলব্ধ, এত সুখের, এত সাধের, রাজ্য-ধন বিনষ্ট হইল,—পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী রমার অকাল-বিয়োগ ঘটিল,—নিজেও শোকে, তাপে ও আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরীভূত হইয়া সপরিবার দেশত্যাগী হইলেন। চিত্তসংযম করিতে না শিখিলে, অন্যবিধ সহস্রগুণ সত্ত্বেও, পুরুষের এইরূপ দুর্গতি ঘটে।

'সীতারাম'-কাব্যে প্রধানতঃ চারিটী স্ত্রী-চরিত্রের সমাবেশ—রমা, নন্দা, শ্রী ও জয়ন্তী। দুইটী গৃহিণী,—একটী কভু গৃহিণী, কভু ভৈরবী, কভু 'ডাকিনী',—চতুর্থটী (আমাদিগের সমক্ষে) চিরসন্ন্যাসিনী। রমা ও নন্দা সীতারামের গৃহিণী, রাজার রাণী, সংসারের সঙ্গিনী। শ্রী তাঁহার পরিণীতা পত্নী হইয়াও, বিধি-লিপি খণ্ডাইবার অনুরোধে, পরিণয়াবধি তাঁহার সংসার হইতে বিচ্যুতা। জয়ন্তী সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া, ভগবৎপ্রেমানুরাগিণী

সন্ন্যাসিনী। সংক্ষেপে ইঁহাদিগের প্রত্যেককে একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাউক।

রমা মহারাজ সীতারাম রায়ের কনিষ্ঠা মহিষী। তিনি পতিপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্যের আকর্ষণে মুগ্ধা মূর্ত্তিমতী সরলতা। সংসারের ভাল-মন্দ বুঝেন না, পরের সুখ-দুঃখ ভাবেন না, রাজ্যের সম্পদ-বিপদ দেখেন না, মানুষের সারল্য-শঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না,—চাহেন কেবল স্বামী-পুত্রের মঙ্গল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যাউক, চরাচর বিনষ্ট হউক, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহার মনের সমগ্র চিন্তা কেবল পতি-পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে। এ প্রেম, এ বাৎসল্য, নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। দুর্ব্বলহৃদয়া বঙ্গপুর-মহিলা-মহলে অনেকেরই চিত্ত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ;—সমগ্র সংসার ভাল বাসিবার, আত্ম-পর সমভাবে দেখিবার, চিত্তপ্রশস্ততা তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আমরা রমার পতিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রথম নিদর্শন দেখিয়াছি—সীতারাম ও তোরাব খাঁর বিবাদ-বৈরিতা-পর্ব্বে। দুরন্ত মুসলমানের সহিত বিবাদ বাধাইলে সীতারাম বিনষ্ট হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, দিবানিশি ঐ ভাবনায় তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। রাজ্য-ধন বিনষ্ট হউক, সুখ-সম্পদ দূরে যাউক, মান-মর্য্যাদা অতল জলে নিমগ্ন হউক,—সীতারাম "ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়েন", তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—রমার ইহাই ঐকান্তিকী ইচ্ছা ; আহারবিহারে রতি নাই, পূজাহ্নিকে মতি নাই, কেবল "হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারে-খারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া দিনপাত করি। এ মহা ভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর"—ইষ্টদেবের নিকটে অনুক্ষণ এই প্রার্থনা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী, অসমসাহসী, সমরকুশল, মহাবল সীতারামের পক্ষে এ ভাব বিরক্তিকর হইল, এত ভালবাসার "রমা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।" তখন তাঁহার শ্রীর কথা মনে পড়িল ; তাঁহার সহধর্ম্মিনী, "উচ্চ আশায় আশাবতী,

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" শ্রীর চিন্তা অন্তরে জাগিয়া উঠিল ; সহর-প্রান্তে গঙ্গারামের কবর-ভূমিতে "মহা মহীরুহের শ্যামল পল্লবরাশি-মণ্ডিতা" শ্রীর সেই "চণ্ডী মূর্ত্তি", সেই বায়ুভরে উড্ডীয়মান "অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম", সেই "মধুরিমাময় দেহ", সেই রণরঙ্গে বিভোর সিংহবাহিনী বেশ, সেই অঞ্চলঘূর্ণিত দিগন্তনিনাদিত "মার্ মার্! শত্রু মার্! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু মার্!"—শব্দ, একে একে সীতারামের মনে উদিত হইল। এ পাপ সংসারে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল ; লঘুচেতা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া রমার সহবাস তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি চন্দ্রচূড়প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের হস্তে রাজ্যভার, এবং নন্দার উপরে অন্তঃপুরের ভার, দিয়া সম্রাটের সনন্দ-প্রাপ্তি-ব্যপদেশে শ্রীর সন্ধানোদ্দেশে দেশত্যাগী হইলেন। রমার জ্বালায় সীতারাম দেশ ছাড়িলেন ; রমা অবশ্য অপরাধিনী, কিন্তু "স্বামী-পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহই সে অপরাধের মূল।" মুসলমানের সহিত বিবাদ করিয়া "পাছে তাহাদের কোন বিপদ ঘটে, এই চিন্তাতেই তিনি ব্যাকুল।"

রমার শেষ অভিনয় তোরাব খাঁ কর্ত্তৃক মহম্মদপুর-লুণ্ঠন-অধ্যায়ে। সসৈন্য সহরলুণ্ঠনোদ্দেশে তোরাব খাঁর আগমনবার্ত্তা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে পৌছিল। সংবাদ রমার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন ; মুসলমান সহর লুঠ করিয়া, সকলকে "খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া চলিয়া যাইবে", তাঁহার বাছার দশায় কি হইবে, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভয়বিহ্বলতায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া হিন্দুকুলললনার, রাজপুরবধূর, অকরণীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন —দুর্ব্বিনীত গঙ্গারামের কুহকগ্রস্তপ্রায় হইলেন। এই মহাপরাধের মূলেও সেই একমাত্র অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্যই প্রবল ভাবে প্রোথিত। পাপিষ্ঠ গঙ্গা-রামের দুরভিসন্ধির অস্ফুট ছায়া যখন মুরলার ইঙ্গিতে তাঁহার অন্তরাকাশে

প্রতিবিম্বিত হইল, তাহার চরিত্রবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া যখন স্বকৃত অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, "মরি, রাজসংসারে মরিব, তথাপি গঙ্গারামের সহায়তায় বাপের বাড়ী গিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিব না" —বলিয়া যখন স্থির সঙ্কল্প করিলেন, তখনও সরলার অন্তরে পুত্রবাৎসল্য সমভাবে দেদীপ্যমান, তখনও "ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি (গঙ্গারাম) স্বীকৃত আছেন, সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন"—মুরলার দ্বারা সেই পাপিষ্ঠের নিকট এই সংবাদ পাঠাইতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। সেই পুত্র-স্নেহের অকপট একাগ্রতায় তিনি এই কলঙ্ক-পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইলেন। যখন 'আম দরবারে' গঙ্গারামের বিচারস্থলে লোকারণ্যমধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূকে সাহসে ভর করিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বলিতে হইল, তখন ভীরু-স্বভাবা রমণীর অন্য কোন সম্বল ছিল না, কেবল অঞ্চলের নিধি পুত্ররত্নের মুখদর্শনই সমস্ত সাহসের মূল। তিনি দরবারে যাইবার পূর্ব্বে নন্দাকে বলিয়া গেলেন,—"কেবল এক কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকটে দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।" বাস্তবিক, সভাস্থলে রমা "যখন একবার একবার (পুত্রের) সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিলেন, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তুলিতে লাগিলেন—তখন পরিষ্কার স্বর্গীয় অপ্সরাবিনিন্দিত তিন গ্রামে সম্মিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে (তাঁহার) সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল।" পরিশেষে "রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া যুক্ত-করে বলিলেন, "মহারাজ ! * * * আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। আপনার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই।" পবিত্র হিন্দুকুলরমণী ভিন্ন এই নির্ম্মল দেবভাবময় পুত্রবাৎসল্য অন্যত্র কদাচ

দৃষ্ট হয়। এমন মুক্তকণ্ঠ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনাতেও যখন মন্দ লোকের সন্দেহ ঘুচিল না, তখনও পতিপ্রাণার কলঙ্ক মুছাইবার অন্য উপায় নাই, তখনও সেই স্বামীপুত্রের প্রতি অনুরাগের উপরই আত্মনির্ভর, তখনও সরলার মুখে সেই একই কথা—"যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই, * * * যেন জন্মে জন্মে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামীপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।" বলিতে বলিতে মর্ম্মপীড়ার প্রবল পেষণে পতিপ্রাণা মূর্চ্ছিতা হইলেন, "সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, রমা আর উঠিলেন না। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিলেন,—নাম রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ আর রহিল না।" চিকিৎসার সহস্র বন্দোবস্ত সত্ত্বেও, এই রুগ্নদশায় রমাকে সীতারাম একবার দেখিতে আসেন না, এই দুঃখে তিনি বিনা ঔষধসেবনে রোগকে প্রশ্রয় দিয়া জীবন শেষ করিলেন। তিনি একদিন নন্দার বিশেষ 'জোর জবরদস্তি'তে তাঁহাকে প্রকাশ্যে বলিলেন—"ওষুধ খাই নাই—খাব, যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।" রাজাকে তখন 'ডাকিনী' পাইয়াছিল! তিনি সহজে আসিলেন না; যখন আসিলেন, তখন চরমাবস্থা। পতিপ্রেমানুরাগিনী সাধ্বী অন্তিমে স্বামিপদ দর্শন করিয়া, স্বামিসমক্ষে একবার অন্তিম হাসি হাসিয়া, পুত্ররত্নকে স্বামীর করে সমর্পণ করিয়া, জন্মের মত বিদায় হইলেন। সেই অন্তিমেও পতিপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্যের একাগ্রতা সমভাবে দেদীপ্যমান; তখনও স্বামীর চরণে শেষ ভিক্ষা—যেন "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

রমার জীবলীলা ফুরাইল। আমরা এখন নন্দাকে দেখি। নন্দা সীতারামের মধ্যমা মহিষী, তবে শ্রী সংসারবর্ত্তিনী না থাকা বশতঃ তিনি মধ্যমা হইয়াও জ্যেষ্ঠা, রাজসংসারের প্রধানা কর্ত্রী। বাস্তবিক, তিনি

হিন্দু অন্তঃপুরের কর্তৃত্বভার লইবার যোগ্যা গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতি ধীর, স্থির, গম্ভীর; তিনি রমার ন্যায় বালিকাবুদ্ধি নহেন, বিপদের ঈষত্তরঙ্গাঘাতে তাঁহার চিত্ত 'হাবু-ডুবু' খায় না। স্বামীপুত্রে অনুরাগ তাঁহারও অন্তরে সমভাবে অক্ষুণ্ণ—তিনি স্বামীকে "মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা" করেন—কিন্তু তিনি প্রেমান্ধ বা স্নেহান্ধ নহেন। পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত; তাঁহার স্বজাতি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি অনুক্ষণ ব্যাপৃতা, কিন্তু পুরুষের কোন কার্য্যের সমালোচনায় প্রস্তুত নহেন। রাজকার্য্য পরিচালন, শত্রুমুখ হইতে আত্মসংরক্ষণ, রাজ্য-সংসার প্রজা-পরিজনের সুখশান্তি অন্বেষণ, প্রভৃতি কার্য্য পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস;—সে সমস্ত কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত নহেন। বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া নন্দার স্বভাব নহে; মুসলমানদিগের আগমন ও সীতারামের দিল্লীগমন বার্ত্তায় কাতর হইয়া রমা যখন "রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন? এখন যদি মুসলমান আসে, ত কে পুরী রক্ষা করিবে? মুসলমানেরা ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?" প্রভৃতি কথা "নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে" গেলেন, তখন নন্দা অবিচলিত ভাবে, বিধাতার উপর বিধানের ফল নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস ও অভয় প্রদান করিলেন, শেষে কোনগতিকে "রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িলেন।"—এরূপ স্থিরবুদ্ধি রমণী ব্যতিরেকে সংসার চলা অসাধ্য।

একটী বিষয়ে আমরা নন্দার চিত্তের অপ্রশস্ততা দেখিতে পাই। সেটী সপত্নীদ্বেষ। রমা, নন্দা উভয়েরই মনে সপত্নীদ্বেষ সমভাবে প্রবল। মুসলমানের হস্তে মৃত্যুভয়ে রমা যখন হতাশ্বাস, তাঁহার মৃত্যু হইলে "ছেলে কে মানুষ করিবে?" ভাবিয়া যখন ব্যাকুল, তখন তাঁহার মনে এইরূপ যুক্তি-তর্ক উদয় হইয়াছিল—"সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমা কি সতীন-পোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে

মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে।” শত্রুহস্তে নিজে মরিব, সতীন বাঁচিবে,—এ কথা মনে স্থান দিতেও রমার কষ্ট হইয়াছিল। সতীনের মৃত্যুকামনা নন্দার অন্তরেও তাদৃশ প্রবল। তোরাব খাঁর আগমনে রমা যখন “ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে” লাগিলেন, তখন নন্দা মনে ভাবিতে লাগিলেন, “সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি।” পুত্রবাৎসল্যের দারুণ চিন্তায় রমা নন্দার নিকটে আত্মীয়তা করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন; স্বামীর আজ্ঞাপালন-অনুরোধে নন্দা “আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে” প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একদিকে পুত্র-স্নেহ, অপর দিকে পতিভক্তি ;—নচেৎ উভয়েই পরস্পর বিনাশকামী। শ্রীর সহিত একত্র বাস করিতে হয় নাই, শ্রী কখন তাঁহার সুখের স্বামিসোহাগের অংশভাগিনী হয়েন নাই, তথাপি, সপত্নীদ্বেষের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, শ্রীর প্রতিও নন্দার সেই একটু হিংসার অস্ফুট ছায়া, একটু শ্লেষের ঘৃণাব্যঞ্জক মর্ম্মভেদী টিট্‌কারী। প্রকাশ্য রাজদরবারে রমাকে “কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে” সীতারাম যখন কুণ্ঠিত, তখন নন্দা বিলক্ষণ একটু ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, “মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সাম্‌নে শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?” অপর সর্ব্বত্রই আমরা নন্দার সেই গম্ভীরতাপূর্ণ অবিচলিত গৃহিণীপণা দেখিতে পাই। পরন্তু যখন মুসলমান সেনা আগতপ্রায়, সুতরাং সপরিবার মৃত্যু সন্নিকট, দেখিয়া সীতারাম একাই সেনামধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত হাতিয়ার লইতে ও নন্দার নিকটে শেষ বিদায় লইতে উপস্থিত, তখন নন্দার মুখে—“মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। * * * রাজকুলের সম্পদ বিপদ উভয়ই আছে, তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে, তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড়

ভাবনা।"—এই উৎসাহ-বাণী শুনিয়া আমরা শ্রীর অভাবে (নন্দা বিদ্যমানে) সীতারামের নিতান্ত দুঃখিত হইবার কারণ দেখিতে পাই না। শ্রীর ন্যায় নন্দাও অনেক পরিমাণে সীতারামের "উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, বিপদে সাহসদায়িনী, সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্য।"

তৃতীয় চিত্র শ্রীর। শ্রী গ্রন্থের নায়িকা; সংসারত্যাগিনী হইলেও সীতারামের জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষী, প্রতিভাময়ী অসামান্যা রূপসী, তাঁহার হৃদয়সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্রাজ্ঞী। বস্তুতঃ শ্রীই সীতারাম কাব্যের অস্থি, মজ্জা, প্রাণ। তিনিই সীতারামের সহিত মুসলমানের বিবাদ বাধাইবার মূল হেতু,—তিনিই মুসলমানের অত্যাচার নিবারণের, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের, মন্ত্রণা বিষয়ে সীতারামের দীক্ষাগুরু,—জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর শিক্ষকতা কার্য্যের তিনিই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কাব্যের প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র-সূত্রে গ্রথিত। 'দেবী চৌধুরাণী'গত প্রফুল্লমুখীর আর 'সীতারাম'গত শ্রীর চরিত্রে আমরা অনেক স্থলে ঘটনার সমবায় দেখিতে পাই। সামাজিক কলঙ্ক-ভয়ে প্রফুল্ল শ্বশুর কর্ত্তৃক বিতাড়িতা,—প্রিয়-প্রাণ-হননের কারণাশঙ্কায় শ্রী আপনা হইতে নির্ব্বাসিতা। উভয়েই অতুলনীয়া প্রতিভাসম্পন্না। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের দীক্ষাগুণে কর্ম্মযোগে যোগিনী,—শ্রী জয়ন্তীর শিক্ষাপ্রসাদে কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানপথানুসারিণী। প্রফুল্লের একাদশীতে মাছ খাওয়া পাঠকজী ছাড়াইতে পারেন নাই,—ভৈরবী সাজাইবার নিমিত্ত জয়ন্তী শ্রীর মাথা মুড়াইতে পারেন নাই; সধবার সমাজ-ধর্ম্মে উভয়েরই অটুট অনুরাগ। তবে প্রফুল্লমুখী অন্তিমে সংসারে থাকিয়া প্রফুল্ল অন্তরে নিষ্কাম কর্ম্মে ব্যাপৃতা; শ্রী সর্ব্ব কর্ম্ম শেষ করিয়া সংসার হইতে নির্লিপ্তা, নৈশ অন্ধকারে লোকলোচনের অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িতা।

প্রতিভা কখন প্রচ্ছন্ন থাকে না; অগ্নিকে কখন ভস্মাচ্ছাদিত রাখা যায় না। কৈশোরে যে প্রতিভা অঙ্কুরিত হয়, যৌবনে তাহার শাখাপ্রশাখা জন্মে, বার্দ্ধক্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি, প্রকাণ্ড কাণ্ড, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গুণের ক্রমোন্নতি সহকারে প্রতিভারও ক্রমবিকাশ সঙ্ঘটিত হয়। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়তায়, বার্দ্ধক্যে—তমঃ-রজঃ-সত্ত্ব ত্রিগুণের ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটে; অজ্ঞানতম-সাচ্ছন্ন শিশুর যৌবনে জ্ঞানোন্মেষ হয়, কিন্তু শিক্ষা ও সঙ্গ দোষে এবং যৌবনসুলভ মদান্ধতায় রাজসিক বৃত্তিসমূহ বিকসিত হইয়া উঠে; ঘোর পাপিষ্ঠ ভণ্ডকেও কিন্তু পরিণামে স্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপে প্রপীড়িত, পরন্তু ভগবৎপ্রেমানুরত, হইতে দেখা যায়; সাত্ত্বিক ভাবের আভা তখন অলক্ষ্যে চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। প্রতিভাও তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল; প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের প্রতিভার আভা শিশুর ক্রীড়াতেই প্রথম দেখা যায়, যৌবনে তাহার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, পরিণতাবস্থায় তাহার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ অন্তর্নিবদ্ধ থাকিয়াও চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয়—সর্ব্বস্থল উদ্ভাসিত করে। ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে; ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র—ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ, জীবন্ত সাক্ষী। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না শ্রীর প্রতিভারও আমরা তাদৃশ ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। প্রথম হইতেই শ্রীর স্বজাতিপ্রাণতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা-বিমিশ্র ধর্ম্মানুরক্তি পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে; গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য সীতারামকে উত্তেজিত করিবার প্রথম মন্ত্রই—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" তার পরেই গঙ্গারামের কবর-ভূমে "বৃক্ষারূঢ়া মূর্ত্তিমতী বনদেবী"-বেশে শ্রীর দিগন্তস্পর্শী "মার্! মার্! শত্রু মার্" শব্দে রণরঙ্গে ঘোর উৎসাহ দান। "চণ্ডীর উৎসাহে" (শ্রীর প্রবল প্রতিভা-গুণে) বলবান হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না,—"হিন্দুর রণজয় হইল।"

এইরূপে তাঁহার জীবনের ‘দিবা’ভাগের অবসান হইল, তাঁহার সাংসারিক ‘গৃহিণী’ অবস্থা কাটিল। অতঃপর তিনি ভৈরবী। নদীসৈকতে স্বামী-মুখে নিজ বিধিলিপির অখণ্ডনীয় ফল শ্রুত হইয়া, জন্মগ্রহের অবস্থাদোষে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। “স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে,—সহবাসে থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর (সর্ব্বাপেক্ষা) প্রিয়”, সীতারাম তাঁহার “চির প্রিয়”—এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার “শত যোজন দূরে থাকিবেন, স্থির করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি “সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, (নৈশ) অন্ধকারে কোথায় মিশাইলেন, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।” তার পরেই পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। এই খানেই প্রতিভা উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে উত্থিত হইল, মধুরে মধুর মিলিল, মণি-কাঞ্চন-সংযোগ হইল। এই স্থান হইতেই শ্রীর শিক্ষা আরম্ভ হইল, নবজীবন লাভ হইল, প্রতিভা নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র সত্যে পর্য্যবসিত হইল। শ্রী যখন সাংসারিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, জ্বালা জুড়াইবার জন্য, বৈতরণীর এপারেই পাপের বোঝাটার শীঘ্র শীঘ্র “ বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া” যাইতে ব্যগ্র, তখন জয়ন্তী দুই চারি পাকা কথায় তাঁহার মন টলাইয়া আপন পথের সঙ্গিনী করিলেন, ‘গৃহিণী’বেশ ছাড়াইয়া—“গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি”, পরাইয়া—এক অপূর্ব্ব “রূপসী ভৈরবী” সাজাইলেন। জয়ন্তীর সংঘর্ষে শ্রীর প্রতিভা সমধিক প্রভাম্বিতা হইয়া উঠিল,—তিনি ক্রমে নির্ব্বন্দ্ব হইয়া শুভাশুভ ভগবানে অর্পণ করিতে শিখিলেন, স্বামী ভুলিয়া ‘স্বামীর স্বামী’কে চিনিলেন, জ্ঞানের সুন্দর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিনে এ কার্য্য হয় নাই, এক কথায় সন্দেহ ঘুচে নাই, এক মুহূর্ত্তে মনের ময়লা কাটে নাই, এক ভৈরবী-সাজেই সন্ন্যাস-সাধনা হয় নাই। কত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কত পাক-চক্রে পড়িতে হইয়াছিল, কত শিক্ষা-দীক্ষা “ঝাড়ফুঁক” করা

গিয়াছিল, তবে 'খাঁটি' দাঁড়াইয়াছিল,—চিত্তবৃত্তি অন্ধকার হইতে আলোকে পঁহুছিয়াছিল।

জয়ন্তী শ্রীর দীক্ষাগুরু হইলেও, এক বিষয়ে তাঁহাকে শ্রীর নিকটে ঠকিতে হইয়াছিল। শ্রীর আত্মবৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ ছল-চল নেত্রে জয়ন্তী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে? শ্রী তখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?" প্রত্যুত্তরে জয়ন্তী কহিলেন, "আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি।" পতিগতপ্রাণা শ্রী তখন অকপটে কহিলেন, "যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম। * * * কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া দিয়ালে মাথাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাথাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন ভোর কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া, অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি।" —এই বিশ্বাসেই হিন্দুর প্রতিমা-পূজা—তেত্রিশ কোটী দেবতা—ভূচর খেচর জলচর, তরু গুল্ম লতা, পত্র পুষ্প ফল, নদ নদী সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, জল বায়ু আকাশ—সমস্তই তাঁহার আরাধ্য। তিনি মৃণ্ময় শিবলিঙ্গে জলসেক করেন না, শালগ্রাম-শিলাকে 'ভোগ' দেন না, জলপূর্ণ কলসে মালা চড়া'ন না;—তিনি সর্ব্বত্র সকল সময়ে সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, পরম পুরুষের, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দের, সত্বাকে

উপলব্ধি করিয়া স্নেহ-বাৎসল্যের আবেগে, প্রেম-ভক্তির উত্তেজনায়, কখন ছানা-ননী খাওয়ান, কখন ফুল-বিল্বপত্র দেন, কখন জল-চন্দন চড়া'ন, আর "নিবেদয়ামি আত্মানং" বলিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগসাধনের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।—পরম জ্ঞানী জয়ন্তীকে একবার এ যুক্তিতে, এ বিশ্বাসে, নির্ব্বাক্ হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর এই বিশ্বোদর দেবভাব যিনি ঘুচাইতে চাহেন, তিনি, জ্ঞানী হইলেও, ভাবুক নহেন।

কাব্যের শেষ ও সর্ব্বোচ্চ চিত্র—জয়ন্তী। আমরা সে চিত্র সীতারামের সৌধশিখরে গৃহের সুষমা বৃদ্ধি করিতে দেখি নাই—বনে বনে, পথে পথে, গিরি-গুহায়, দেশ-বিদেশে, সে চিত্রের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক লোকের হৃদয়-ফলকে সে চিত্র অঙ্কিত হউক, হৃদয়ের শোভা হইবে, চিত্রের জ্যোতিচ্ছটায় চিত্রাধার আলোকিত হইবে। বৈতরণীতীরে ভৈরবীবেশে জয়ন্তীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ; তৎপূর্ব্বে সুবর্ণরেখাতীরে তাঁহার সহিত শ্রীর আর এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে আমাদিগের অজ্ঞাতে। ভৈরবী এখনও ভাদ্র মাসের ভরা 'গাঙ্', এখনও তাঁর "তুফানের বেলা হয় নাই।" ভৈরবী অতুলনীয়া সুন্দরী;—নন্দা অপেক্ষা রমা সুন্দরী, রমা অপেক্ষা শ্রী সুন্দরী, ভৈরবী শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, 'ঘষা ফানুষের অভ্যন্তরস্থ আলোকবৎ,' সে সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিতেছিল; ভৈরবীর ফুল্লাধরে মধুর হাসি যেন মেঘাবৃত আকাশে অনুক্ষণ বিজলী খেলিতেছিল। জ্ঞানপ্রদীপ্ত চিত্রের সেই ভাস্বর, প্রভান্বিতা, দীপ্তিময়ী, মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে, সেই চিনিয়াছে—তিনি কৈলাসচারিণী বৈকুণ্ঠবিহারিণী জয়ন্তী, লীলাময়ী মূর্ত্তিমতী দেবী; শ্রী ও জয়ন্তীর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী যুগল ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শনে মুসলমানের ভীষণ সৈন্যসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। জয়ন্তীর শিক্ষাগুণে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ'প্রচার' হইয়াছে, শ্রীর সঙ্গে সমগ্র হিন্দুর 'নবজীবন' লাভ ঘটিয়াছে।

'সীতারাম'-এর কবি জয়ন্তীকে বেশী কাজ করা'ন নাই, তাঁহার দ্বারা বেশী কথা বলা'ন নাই ; অথচ তাঁহার কার্য্যে যাহা আছে, তাঁহার কথায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্র সীতারামে তাহা নাই,—নন্দা, রমা, শ্রী, কাহাতেও তাহা নাই। ক্ষুদ্র কীটের জীবলীলায় সর্ব্বলোকবিধাতা ভগবানের বিশ্বসৃষ্টিকাণ্ড লক্ষিত হয়। কাব্যের এক ছত্রে কবির শ্রুতি-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত-মনস্তত্ত্ব, সমস্ত প্রকাশ পায়।

১। "তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না। আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না।"

২। "যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃ স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়।"

৩। "মনোবৃত্তি সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই ?"

৪। "আর এগার জন (শত্রু) আপনার শরীরে ? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি ! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি ! একে কি বলে সন্ন্যাস ?"

৫। "রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি ? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা ? এই কি তোমার সন্ন্যাস ?"

৬। "তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার, তাই কর।"

৭। "অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না। স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে ?"

৮। "যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না।"

৯। "আমরা সন্ন্যাসিনী—জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

১০। "যদি শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ?"

—'সীতারাম' কাব্যে জয়ন্তীর মুখে আমরা এই দশটীমাত্র কথা শুনিতে পাই,—শ্রীর প্রতি তাঁহার কথিত এই দশবিধ উপদেশ ; এই উপদেশের উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত, ইহাতেই উহার অস্তিত্ব। 'গীতা'-ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগসূচিত এই দশ আদেশ দেশে দেশে গীত হউক।

স্ত্রীলোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারে না। জয়ন্তী "পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি" দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্নিবার লজ্জা তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিল। "সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না।" তাই যখন সীতারাম তাঁহাকে লোকসমক্ষে যবন কর্ত্তৃক বিবস্ত্রা করাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি একবার কাতর হইয়াছিলেন,—আত্মরক্ষার জন্য জগন্নাথকে আকুল প্রাণে হৃদয় খুলিয়া ডাকিয়াছিলেন। যে আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ জনার্দ্দন একদিন সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ কাতরপ্রাণা পাঞ্চালীর লজ্জানিবারণ করিয়াছিলেন, সেই লজ্জানিবারণকারীর কৃপায় নন্দা কর্ত্তৃক জয়ন্তীর লজ্জারক্ষা হইয়াছিল। সরল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি এইরূপেই লজ্জারক্ষা করেন,—নিপীড়িতের শান্তিবিধান করেন। আমরা নিপীড়িত, পরপদলাঞ্ছিত, পাপ-তাপে পরিতপ্ত,—আমরা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত, অনন্তসৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ ;—"হরি নামে অনন্ত মিলে",—এস একবার বুক বাঁধিয়া, প্রাণ ভরিয়া, মধুর হরিনাম করি,—এস একবার, "প্রাণ মনঃ খুলে, সেই প্রাণের

ভাই-বন্ধু মিলে ডাকি."—এস একবার "সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান" করিয়া ভগ্নকণ্ঠে মহাগীতি গাই—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

* * * *

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥"